মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈসায়ী
মুহাররম-সফর-১৪৪৩ হিজরী
ভাদ্র-আশ্বিন-১৪২৮

মসজিদ তোবা, করাচি, পাকিস্তান

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব	৪র্থ বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর		২০২১ ঈসায়ী
মুহাররম-সফর		১৪৪৩ হিজরী
ভাদ্র-আশ্বিন		১৪২৮ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুন নূর বিন আবদুল জব্বার

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ ইবরাহীম আবদুল হালীম মাদানী
শাইখ আবদুন নুর বিন আবু সাঈদ মাদানী
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

সম্পাদক	: ০১৭১৬১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক	: ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
সার্কুলেশন বিভাগ	: ০১৭৮৮-৪০২৯৮৮
	০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল

tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٥٠٦٠٥٤٠
المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس التحرير : العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، المشرف العام للمجلة (مؤقتا) : السيد محمد روح الأمين، رئيس التحرير : الأستاذ الدكتور أحمد الله ترياشي ، مساعد التحرير : الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

- **দারসুল কুরআন** (সূরা ইখলাস-গুরুত্ব ও ফযীলত).....০৩
  শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
- **দারসুল হাদীস (ডান হাতে পানাহার).....০৬**
  শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা
- **সম্পাদকীয়** (সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি নবীনদের মানবিক দায়িত্ব).....০৯

প্রবন্ধ :

- **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ**.....১০
  মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
- **শিয়াদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকীদাহ**.....১৩
  শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী
- **খলীফা ও খেলাফতের হাকীকাত**.....১৭
  মুফতি মো: আব্দুর রউফ বিন মো: আইয়ুব আলী মাদানী
- **বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**..... ২১
  শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক
- **ইলম ও পরহেযগারিতা**.....২৫
  অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

শুব্বান পাতা

- **অনুকরণীয় আদর্শ; মানুষ মুহাম্মদ (সা:)** ৩২
  মো: আবদুল হাই
- **সফর মাস; জানা অজানা কিছু কথা**.....৩৭
  আল-আমিন বিন আকমাল
- **নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম**.....৩৯
  হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল
- **বন্ধকি জমি ভোগ দখল সংক্রান্ত ইসলামী আইন**.....৪৩
  মেহেদী হাসান সাকিফ
- **কবিতার সমাহার**.....৪৪
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল**.....৪৫

দারুল কুরআন/من دروس القرآن

সূরা ইখলাস- গুরুত্ব ও ফযীলত

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী*

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ اللَّهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

সরল অনুবাদ : বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমকে নাযিল করেছেন গবেষণা করার জন্য এবং এর বিধান আমল করার জন্য। আল্লাহ বলেন:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[২]

আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনকে রোগ-ব্যাধির নিরাময় এবং আলোকবর্তিকা ও হিদায়াতস্বরূপ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের জন্য ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।[৩]

আল্লাহ আরো বলেন: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ বল, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক।[৪]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এমন সূরাও নাযিল করেছেন যার আওয়ায প্রতিনিয়ত আমাদের কানে প্রতিধ্বনি হয়। যেই সূরাটির গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করা একান্তই প্রয়োজন। আর সেই সূরাটিই হলো- সূরা ইখলাস।

আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ: بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ»

একজন আনসারী মসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদিন জনৈক মুক্তাদীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি সূরা ইখলাস পাঠ করেন, তারপর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কী ব্যাপার? আপনি কি মনে করেন যে, সূরা ইখলাসের সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না? হয় শুধু সূরা ইখলাস পড়ুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন। আনসারী জবাব দিলেন: আমি যেমন করছি তেমনি করব, তোমাদের

* ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।

[১] সূরা ইখলাস

[২] সূরা সোয়াদ আয়াত: ২৯

[৩] সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত: ৮২

[৪] সুরা ফুস্সিলাত আয়াত: ৪৪

পছন্দ না হলে বল, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি। মুসল্লিরা দেখলেন যে, এটা মুশকিলের ব্যাপার! কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁরা অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না (সুতরাং তিনিই ইমাম থেকে গেলেন)। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গমন করলে মুসল্লিরা তাঁর কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি মুসল্লিদের কথা মান না কেন? প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড় কেন?' ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন: হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন: এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছে।[৫]

আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত:

«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ»

রসূল ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা কেউ কি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে? সাহাবীদের কাছে এটা খুবই কষ্টসাধ্য মনে হল। তাই তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে? রসূল ﷺ বললেন: জেনে রেখ যে, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[৬]

আল্লাহর নবী ﷺ অন্যান্য আরো সূরার সঙ্গে এই সূরাটি দিয়ে আরোগ্য কামনা করতেন। আর পূর্ণ কুরআনই হলো শিফা।

আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত,

" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

নবী ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে, এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন।[৭]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ আল্লাহ তাআলা বলেন: হে নবী! বল: আমাদের রব আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর মতো আর কেউই নেই। তার উপদেষ্টা অথবা ওযীর নেই। তাঁর সমান কেউ নেই যার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি একমাত্র ইলাহ্ বা মা'বুদ হওয়ার যোগ্য। নিজের গুণবিশিষ্ট ও হিকমত সমৃদ্ধ কাজের মধ্যে তিনি একক ও বে-নযীর। অতঃপর বলেন: اللَّهُ الصَّمَدُ - তিনি অমুখাপেক্ষী, সমগ্র মাখলুক ও গোটা বিশ্বজগত তাঁর মুখাপেক্ষী।

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণনায়, ইকরিমাহ رضي الله عنه বলেন: **'সামাদ'** তাঁকেই বলে যাঁর কাছে সৃষ্টির সকল কিছুর চাওয়া পাওয়া নির্ভর করে এবং যিনি একমাত্র অনুরোধ পাবার যোগ্য।

আলী ইবনু আবী তালহা رضي الله عنه ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করে যে, **'সামাদ'** হলো ঐ সত্ত্বা যিনি নিজের নেতৃত্বে, নিজের মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যে, নিজের বুযর্গীতে, শ্রেষ্ঠত্বে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিকমতে, বুদ্ধিমত্তায় সবারই চেয়ে অগ্রগণ্য। ঐসব গুণ শুধুমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি পূত-পবিত্র মহান সত্ত্বা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবারই উপর বিজয়ী ও বে-নিয়ায।

এরপর আল্লাহ বলেন:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - আল্লাহর সন্তান-সন্ততি নেই, পিতা-মাতা নেই, স্ত্রী নেই। যেমন কুরআনুল কারীমের অন্যত্র রয়েছে।

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কী করে? অথচ তাঁর জীবনসঙ্গিনী কেউই নেই। তিনি প্রতিটি জিনিষ সৃষ্টি করেছেন।[৮] অর্থাৎ তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক, এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টি ও মালিকানায় সমকক্ষতার

[৫] *সহীহ বুখারী হা: ১৫৫*
[৬] *সহীহ বুখারী হা: ৫০১৫*
[৭] *সহীহ বুখারী হা: ৫০১৭*
[৮] *সূরা আন আম আয়াত: ১০১*

দাবিদার কে হতে পারে? অর্থাৎ তিনি উপরোক্ত সমস্ত দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ○ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।[৯]

সূরাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ববাদ সাব্যস্ত করা এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, তা বাতিল করা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ﴾

আর ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।[১০]

২. এই সূরাটি ইসমে আ'যম তথা আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম বিশিষ্ট সূরা। যে নামের দ্বারা কোন কিছু চাইলে তা দেয়া হয় এবং ঐ নামের মাধ্যমে দু'আ করলে সেই দু'আ কবুল করা হয়।

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»

নবী করীম ﷺ একজন ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ সাক্ষ্যসহ আবেদন করছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন, আপনি এমন সত্ত্বা যাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই সত্ত্বার শপথ! এ ব্যক্তি ইসমে আ'যমের সাথে দু'আ করেছে। আল্লাহর এ মহান নামের সাথে তাঁর কাছে কিছু যাচঞা করলে তিনি তা দান করেন এবং এই নামের সাথে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করে থাকেন।[১১]

৩. রাতে ঘুমানোর সময় এ সূরাটি রসূল ﷺ পাঠ করতেন। তাই তাঁর উম্মতের জন্য রাতে এবং সকল-সন্ধ্যায়ও পাঠ করা মুস্তাহাব।

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ، وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ، نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»

মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব رضي الله عنه থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বর্ষণমুখর খুবই অন্ধকার কালো রাতে আমাদের সালাত পড়ার জন্য আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কী বলবো? তিনি বললেন, তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা কুল হুয়াল্লাহু (সূরা ইখলাস), সূরা নাস ও ফালাক পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।[১২]

সুধী পাঠকবর্গ! সূরা ইখলাসের গুরুত্ব ও ফযীলতের বিষয়টি উপলব্ধি করে এর উপর আমল করার বিশেষভাবে চেষ্টা করা একান্তই প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন এবং সার্বিক ব্যাপারে আমাদের সহায় হউন। আমীন!!❑❑

[৯] *সূরা আম্বিয়া আয়াত: ২৬-২৭*
[১০] *সূরা তাওবা আয়াত: ৩০*
[১১] *আবূ দাউদ হা: ১৪৯৩, তিরমিযী হা: ৩৪৭৫*
[১২] *আবূ দাউদ হা: ৫০৮৪*

দারুল হাদীস/من أحاديث الرسول

ডান হাতে পানাহার

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা *

عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

উমার ইবনু আবূ সালামাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ছোট থাকাবস্থায় রসূল ﷺ-এর নিকট লালিত-পালিত হচ্ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত ছোটাছুটি করতো৬। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাবার খাও। এরপর থেকে এটাই ছিল আমার খাবার গ্রহণের নিয়ম। (অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দিয়ে নিজের কাছের থেকে খাবার গ্রহণ করা)[১৩]

রাবী পরিচিতি : উমার ইবনু আবূ সালামাহর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আসাদ ইবনু হিলাল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু মাখযূম। তিনি আল কুরাশী আল মাখযূমী। তার উপনাম আবূ হাফস। মাদীনার অধিবাসী। তার মা নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ। ছোট বেলায় তিনি তার মায়ের সাথে নাবী ﷺ-এর নিকট লালিত-পালিত হন। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট হতে সারাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তার মা নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ ﵂-এর সূত্রে ও নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন: আবূ উমামাহ আসওয়াদ ইবনু সাহল সাবিত আল বুনানী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব, আতা ইবনু আবী রাবাহ, কুদামাহ ইবনু ইবরাহীম, ওয়াহাব ইবনু কাইসান এবং তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনু আবী সালামাহ প্রমুখ। আবূ উমার ইবনু আব্দুল বার (রাহি) বলেন: উমার ইবনু আবূ সালামাহ ২য় হিজরীতে হাবাশাতে জন্ম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল নয় বৎসর। উটের যুদ্ধের সময় তিনি আলী ﵁-এর সাথে ছিলেন। পরবর্তীতে আলী ﵁ তাকে পারস্য ও বাহরাইনে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের খিলাফত কালে ৮৩ হিজরীতে মাদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

হাদীসের ব্যাখ্যা: بسم الله "বিসমিল্লাহ বল" অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু কর।

খাবার শুরুতে بسم الله বলার বিধান : যদিও খাবার শুরুতে بسم الله বলার বিধান নিয়ে উলামার মাঝে মতভেদ রয়েছে, তথাপি বক্ষমান হাদীস এবং অন্যান্য যেসব হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, খাবার শুরুতে بسم الله বলা ওয়াজিব তন্মধ্যে হতে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا»

---

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৩] সহীহ বুখারী হা: ৫৩৭৬

[১৪] তাহযীবুল কামাল ২১ খণ্ড ৩৭২-৩৭৪ পৃ:

হুযাইফাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন খাবার অনুষ্ঠানে যখন আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে উপস্থিত হতাম তখন রসূলুল্লাহ ﷺ খাবারে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা খাবারে হাত রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সাথে এক খাবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। এমন মুহূর্তে একটি মেয়ে এলো, মনে হচ্ছিল যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এসেই সে খাবারে হাত দিতে গেলে রসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একজন বেদুঈন এলো, মনে হচ্ছিল যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি তারও হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহর নাম স্মরণ না করে খাবার শুরু করলে শয়তান সে খাবারকে হালাল করে ফেলে। আর সে এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে যাতে তার দ্বারা (এ খাদ্যকে) হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। অতঃপর সে এ বেদুঈনকে নিয়ে আসে এ খাদ্যকে হালাল করে নেয়ার জন্য, কিন্তু আমি তারও হাত ধরে ফেলেছি। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তার (শয়তানের) হাত মেয়েটির হাতের সাথে আমার হাতের মুঠোয়।[১৫]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ "

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে আর প্রবেশের সময় এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে (বিসমিল্লাহ বলে) তখন শয়তান তার সঙ্গীদের বলে, এখানে তোমাদের রাত যাপনের জায়গাও নেই এবং খাবারও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে (বিসমিল্লাহ না বলে) তখন শয়তান বলে তোমরা থাকার জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে (বিসমিল্লাহ না বলে) তখন শয়তান বলে তোমরা থাকার জায়গাও পেলে এবং খবারও পেয়ে গেলে।[১৬]

এ হাদীসদ্বয় থেকে জানা গেল যে, শয়তানের অনিষ্ঠ থেকে বাঁচার জন্য খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার কোন বিকল্প নেই। অতএব খাবারের শুরুতে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করতে হবে। তবে খাবার শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে এর বিকল্প হিসেবে রসূল ﷺ বলেছেন: স্মরণ হওয়া মাত্রই بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ বলে নিবে।[১৭]

وَكُلْ بِيَمِينِكَ "তোমরা ডান হাতে খাও" যদি কোন ওজর না থাকে তাহলে ডান হাতে খাবার খাবে। আর ডান হাতে খাবার গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেননা নাবী ﷺ বাম হাতে খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ»

জাবির ﵁ সূত্রে রসূল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমরা বাম হাতে খাবে না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায়।[১৮]

وعن ابن عمر رضى الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا»

ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং বাম হাতে পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।[১৯]

রসূল ﷺ নিষেধ করার কারণে বাম হাতে খাওয়া ও পান করা হারাম। অতএব ডান হাতে খাওয়া ও পান করা ওয়াজিব।

[১৫] *সহীহ মুসলিম হা: ২০১৭*
[১৬] *সহীহ মুসলিম হা: ২০১৮*
[১৭] *তিরমিযী হা: ১৮৫৮*
[১৮] *সহীহ মুসলিম হা: ২০১৯*
[১৯] *সহীহ মুসলিম হা: ২০২০*

وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ তোমরা কাছের থেকে খাবার খাও। অর্থাৎ, পাত্রে যদি একই ধরনের খাবার থাকে এবং একই পাত্র হতে একাধিক লোক খাবার গ্রহণ করে তাহলে অবশ্যই নিজের কাছের থেকে খাবার খাবে। অন্যের সামনে থেকে খাবার নিবে না। তবে হ্যাঁ একই পাত্রে যদি একাধিক ধরনের খাবার থাকে তাহলে অন্যের সামনে থেকে খাবার নিতে কোন বাধা নেই।

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ «يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ القَصْعَةِ» ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার এক দর্জি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন: আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে গেলাম। খেতে বসে দেখলাম তিনি পাত্রের সবদিক থেকে কদুর টুকরা খুঁজে-খুঁজে বের করছেন। সেদিন হতে আমি কদু পছন্দ করতে থাকি।[২০]

খাবার পাত্রে গোশতের টুকরা ও কদুর টুকরা ছিল। রসূল ﷺ তাঁর পছন্দ অনুযায়ী গোশতের টুকরা না নিয়ে পাত্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেছে বেছে কদুর টুকরা নিচ্ছিলেন। এ থেকে জানা গেলো যে, পাত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য থাকলে পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য বেছে বেছে নেয়া যেতে পারে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক।

২. ওযর ব্যতীত ডান হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩. এক পাত্র হতে একাধিক লোক খাদ্য গ্রহণ করলে নিজের কাছের দিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

৪. পাত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য থাকলে পছন্দমত খাদ্য বেছে নেয়া যায়।

৫. এক পাত্র হতে একাধিক লোকের খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নাত।

৬. খাদ্য গ্রহণকালে রসূল ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ।

৭. রুচি অনুযায়ী হালাল খাদ্য গ্রহণ করা ও বর্জন করা বৈধ।

৮. ওযর ব্যতীত বাম হাতে পানাহার করা হারাম।

৯. বাম হাতে পানাহার করা শয়তানের অভ্যাস।

১০. বাম হাতে পানাহার করলে শয়তানের অনুকরণ করা হয় তাই তা বর্জনীয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সুন্নাতী পদ্ধদিতে পানাহার করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥❑❒

এজেন্ট- গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭৮৮৪০২৯৮৮
০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

মূল্য: ২৫ টাকা

[২০] *সহীহ বুখারী হা: ৫৩৭৯*

সম্পাদকীয় الافتتاحية

সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি নবীনদের মানবিক দায়িত্ব

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

বর্তমানে ৬০ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিকদেরকে 'সিনিয়র সিটিজেন' (Senior Citizen) বলে। বাংলায় 'মুরব্বী' শব্দটির ব্যবহার আছে প্রবীণদের ক্ষেত্রে। ইংরেজি 'সিনিয়র সিটিজেন' শব্দটিতে একটি সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশমান 'বয়স্ক নাগরিক'। সিনিয়র সিটিজেনরা তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, পরিশ্রম অভিজ্ঞতা ও জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞতায় গড়ে তুলেছেন ইতিহাস, সমৃদ্ধি ও সভ্যতা। সন্তানের গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা, তাকে নিজ পায়ে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে প্রবীণ তথা পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার অবদান সর্বশীর্ষে। ধ্যানে-জ্ঞানে, সাধনায়-শ্রমে, আজকের প্রবীণরা তাঁদের জীবন-যৌবনের সবটুকু অর্জন পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণে উজাড় করে রেখে যান। সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মর্যাদা প্রদান, শেষ বয়সে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, সহযোগিতা করা নবীনদের দায়িত্ব। বর্তমানে দেশে প্রবীণদের প্রতি নবীনদের উদাসীনতা অবহেলা অবজ্ঞার মানসিকতা সবাইকে হতাশ করে। দেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখের মত সিনিয়র সিটিজেন রয়েছেন। ১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় সিনিয়র সিটিজেন দিবস। আমাদের দেশেও এর গুরুত্ব বিবেচনায় প্রবীণদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্য বিষয়ে গণসচেতেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ দিবসটি পালন করা হয়। বয়সের শেষ প্রান্তে এসে প্রবীণরা কর্মক্ষমতা হারান, হারিয়ে ফেলেন উপার্জনক্ষমতাও। তখন তারা অনেকেই সন্তান বা পোষ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নিঃসন্তানদের সমাজের নবীনদের হাতের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তখনই শুরু হয় তাঁদের প্রতি অমানবিক আচরণ, অবহেলা বা অবজ্ঞা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এহেন আচরণ বড় কষ্টের ও বেদনার। পুরুষ প্রবীণদের তুলনায় নারী প্রবীণদের প্রতি অবজ্ঞা উদাসীনতা ও দুর্ব্যবহারের মাত্রা অনেক বেশি। ইসলামে প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর বাণী- 'যে বড়কে সম্মান করে না এবং ছোটকে স্নেহ করে না সে আমার দলভুক্ত নয়'। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও দায়িত্ব পালন সন্তানের প্রতি আবশ্যকীয় বিষয়। 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন- তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। তাঁদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপণীত হলে, তাঁদের প্রতি 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না, বরং তাঁদের সাথে বিনম্র আচরণ করো....'। অবাধ্য সন্তানের জন্য রয়েছে পরকালে কঠিন শাস্তি। অসন্তুষ্ট পিতার সন্তানের জন্য রয়েছে রবের অসন্তুষ্টি। এতো সব কঠোর নির্দেশনা থাকার পরও আমরা দেখতে পাই, বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ পিতাকে শিক্ষিত সন্তানেরা বাড়ির বাইরে ফেলে যায়। যে ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বৃদ্ধা মাকে বস্তায় ভরে সিরাজগঞ্জে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল উদরে ধারণ করা নিজ সন্তানেরা। সারাজীবন যারা সন্তানের জন্য কষ্ট করেছে, নিজে না খেয়ে সন্তানের জন্য খাবার জুটিয়েছে, শেষ বয়সে তাদের ঠিকানা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। পথে ঘাটে চলতে দেখা যায়, প্রবীণ বয়োবৃদ্ধ কোন ব্যক্তিকে গাড়ীতে উঠতে নবীনদের সাথে পাল্লা দিতে হচ্ছে, বয়োবৃদ্ধ মানুষটি গাড়ীতে সিট না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ তারই সামনে সিটে বসে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে কোন যুবক গান শুনছে। বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল পরিশোধের জন্য কোন প্রবীণ-বৃদ্ধ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ কোন যুবক চাতুরতা করে লাইনে না দাঁড়িয়ে নিয়ম ভেঙে ভিতরে পবেশ করছে। এমন হাজারো জায়গায় প্রবীণদের প্রতি অসম্মান, অবজ্ঞা, অবহেলা দেখা যাচ্ছে, যা মানবিকতার মানদণ্ডে নিষ্ঠুর আচরণ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে বড় অপরাধ। প্রবীণদের প্রতি সম্মান দিতে হবে, তাঁদেরকে সাহায্য সহায়তা করতে হবে, তাঁদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হবে, তাঁদেরকে এগিয়ে রাখতে হবে সব জায়গায়- এ শিক্ষাও যেন আজ সমাজ থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষ প্রবীণদেরকে নিজ ঘরে, সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা হিসেবে মনে করা হচ্ছে। দীনী শিক্ষার অভাব, মূল্যবোধের অভাব, সামাজিক সদাচরণের অনুশীলনের অভাব, যৌথপরিবার ভেঙে আত্মকেন্দ্রীক ক্ষুদ্র পরিবার বেড়ে যাওয়ায় নবীনদের মধ্যে স্বার্থপরতা, হীনতা তাদেরকে প্রবীণদের প্রতি উদাসীন করে তুলছে। মানবিক বিপর্যয়ের এ সময়ে প্রত্যেকের মনে রাখা প্রয়োজন; একদিন নিজেকেও এ স্থানে এসে দাঁড়াতে হবে। সেদিন হয়ত সে সময়ের প্রজন্ম এ সময়ের আজকের অমানবিক আচরণকারীদের প্রতি প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং আগামী দিনের জন্য আজকেই প্রবীণদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব পালন করে ভাল কিছু রেখে যাওয়া কর্তব্য। তা না হলে হয়তো তখন অবহেলা অবজ্ঞায় বৃদ্ধাশ্রমই হবে আজকের উদাসীনদের শেষ আশ্রয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত অন্যতম উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি ও সাংগঠনিক সেক্রেটারি, খুলনার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মা'হাদ আস সালাফী-এর প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক, কলারোয়া সরকারি কলেজের সম্মানিত সুযোগ্য সাবেক অধ্যক্ষ, প্রফেসর আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্যারের ঘনিষ্ট সহচর, বহু গবেষণা গ্রন্থের লেখক, গবেষক, প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান স্যার আমাদেরকে ছেড়ে মহান আল্লাহর ডাকে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর নেক আমলসমূহের বিনিময়ে জান্নাতের সুউচ্চ মাক্বাম দান করে সম্মানিত করুন। মাসিক তরজুমানুল হাদীসের পক্ষ থেকে তাঁর মাগফিরাত কামনা করছি ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমীন ❑❑

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান★

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত–

১৫। মানত মানা–

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

অর্থাৎ যারা মানত পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী।[১]

যারা মানত পুরা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।

অতএব, মানত হলো, আল্লাহ যা পছন্দ করেন এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মানত পূর্ণ করা।

সুতরাং এটি শরীয়তসম্মত ও ইবাদত। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এ বিষয়টি অন্যের জন্য পালন করল সে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করল।

মানতের প্রকারভেদ :

মানত করা দুই প্রকার–

১। প্রথম প্রকার– (সাধারণ মানত) মানত মাকরুহ–

প্রথম পর্যায়ে– এটি এমন কোন ব্যক্তি কোন ইবাদত পালনের মানত করল, তাতে সে নিজের উপর তা জরুরি করে নিল, আল্লাহ তাকে না দেয়া বা নির্ধারণ না করা সত্ত্বেও। যেমন সে বলে– আল্লাহর উদ্দেশে আমি এক দিন রোযা রাখব বা হজ্জ করব বা ওমরা করব বা এত পরিমাণ দান-খয়রাত করব। এরূপ মানত হলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করে সে যেন তা পালন করে এবং যে আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করে সে যেন অবাধ্যতা না করে।[২]

এ ধরনের মানত পূর্ণ করার অপরিহার্যতার শর্তাবলী–

ক) মানত যেন আল্লাহর আনুগত্যে হয়। যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ...الحديث.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুসরণের মানত করবে সে যেন তাঁর অনুসরণ করে।[৩]

খ। মানত যেন সাধ্য-সামর্থ্যের মধ্যে হয়। যেমন উকবা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন–

نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

অর্থাৎ আমার বোন মানত করে যে, সে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ যাবে। তাই সে আমাকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এ ব্যাপারে ফাতাওয়া জিজ্ঞাস করার নির্দেশ দেয়। সুতরাং আমি তাকে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করি, অতএব, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– সে যেন চলে ও আরোহণ করে।[৪]

গ। মানত যেন স্বীয় কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যাপারে হয়। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং বনী আদম যার সামর্থ্য রাখে না তাতে মানত পূর্ণ করা যাবে না।[৫]

২। দ্বিতীয় প্রকার– গুরুতর মাকরুহ মানত, যা প্রথমটি হতে কঠিন। এটি এমন মানত যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে কোন নির্ধারিত মানত করল, কোন জিনিস হওয়ার শর্তে বা আল্লাহ যদি তার ভাগ্যে এমন কিছু রাখেন তবে...।

যেমন সে বলল আল্লাহ যদি আমার রোগ ভাল করে দেন তবে আমি আল্লাহর জন্য এক দিন রোযা রাখব বা সে বলল আমি যদি এত পরিমাণ অর্থ অর্জন করি তবে আল্লাহর উদ্দেশে আমি তা হতে এ পরিমাণ অর্থ দান খয়রাত করব।

★ *দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১] *সূরা দাহর আয়াত:৭*

[২] *সহীহ বুখারী*

[৩] *সহীহ বুখারী*

[৪] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*

[৫] *আবূ দাউদ– সহীহ*

মানতকারীর উদ্দেশ্য পূরণ হলে এ ধরনের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর এ মানতের সূচনা করা গুরুতর মাকরুহ। যা হতে নবী ﷺ নিষেধ করে বলেন–

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ মানত কোন কল্যাণ বয়ে আনে না বরং এর দ্বারা কৃপণ হতে কিছু অর্থ বের করা হয়।[৬]

মুসলিম মণীষীগণ বলেন– যে ব্যক্তি এমন ধারণা করে যে, মানত করা ব্যতীত তার কোন প্রয়োজন পূর্ণ হবে না তবে তার এমন আকীদা পোষণ করা হবে হারাম। কেননা সে যেন ধারণা করে আল্লাহ বিনিময় ব্যতীত কিছু দিবেন না। এটি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বড় খারাপ ধারণা এবং তার ক্ষেত্রে এক জঘন্য আকীদা বরং নিশ্চয়ই তিনি বান্দার প্রতি বড় কৃপাবান, অনুগ্রহকারী ও নেয়ামত দানকারী।

মানতের ক্ষেত্রে কতিপয় মাসয়ালা–

* হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করা হতে সতর্ক হোন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করে সে আল্লাহর সাথে এমন বড় শিরক করে যা তাওহীদের পরিপন্থী। এমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত হলো মাজারের নামে মানত করা, প্রতিমা ও আস্তানার নামে মানত করা, এমনকি যদি কাবার নামে মানত করে তবুও, সুতরাং এসব বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব, বাদাভী, সাইয়্যেদ. খাজাবাবা, বড়পীর জিলানী প্রমুখের নামে মানত করা হতে যেন সবাই সতর্ক থাকে এবং এসব আমল হতে আল্লাহর নিকট তওবা করে।

* জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত, যেমন খাজা বাবা ও অন্যান্যের নামে মূলত মানত প্রতিষ্ঠিত হবে না। অতএব, তা পূর্ণ করা জায়েয নয় (তা পূর্ণ করা হারাম) তা বর্জনের ফলে কাফফারা আদায় করুন, আল্লাহর নিকট তওবা করা জরুরি।

হে মুসলিম! যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মানত করবে, যেমন বলবে– আল্লাহর উদ্দেশে আমি মদ্যপান করবই, এরূপ মানত হারাম, তবে তা–

(ক) মানত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, কিন্তু তা পূর্ণ করা হারাম। কেননা আল্লাহর অবাধ্যতা দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করা যায় না।

(খ) এ মানত (আল্লাহর অবাধ্যতায়) করার কারণে তার কাফ্ফারা দেয়া জরুরি। কেননা নবী ﷺ বলেন–

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

অর্থাৎ গুনাহের ক্ষেত্রে মানত নেই, আর তার কাফফারা হলো কসমের কাফফারার অনুরূপ।[৭]

* যদি আপনি মানত করেন, কিন্তু মানতের নাম উল্লেখ না করেন, যেমন আপনি যদি বলেন– আল্লাহর ওয়াস্তে আমি মানত করলাম তবে আপনার উপর কসমের কাফফারা জরুরি। কেননা উকবা ইবনে আমের বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

অর্থাৎ মানতের কাফফারা হলো কসমের কাফফারা।[৮]

* যে ব্যক্তি ইসলাম কবূলের পূর্বে আল্লাহর কোন আনুগত্যের মানত করার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার ওপর উক্ত আমলের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। কেননা উমার رضي الله عنه বলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলী যুগে মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফ করব, তিনি বলেন– তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।[৯]

আপনি যদি কোন বৈধ ব্যাপারে মানত করেন যেমন বলেন, আমি পাগড়ি পরিধানের মানত করলাম, বা এ ধরনের অন্য কিছু তবে তা পূর্ণ করা আপনার জন্য শরীয়ত সম্মত। কেননা হাদীসে এসেছে–

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ .

অর্থাৎ একজন মহিলা নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল– হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ নিশ্চয়ই আমি মানত করেছি

[৬] *সহীহ মুসলিম*

[৭] *আহমাদ, আহলুস সুনান– সহীহ*

[৮] *সহীহ মুসলিম*

[৯] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*

যে, আপনার মাথায় আমি দুফ বাজাব, তিনি বলেন– তুমি তোমার মানত পুরা কর।

* হে আল্লাহর বান্দা! জেনে রাখুন, যে বিষয়ে মানত সম্ভব নয় তা পূর্ণ করাও জায়েয নেই। যেমন ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.

অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং বানী আদম যার মালিক নয় তাতে কোন মানত নেই।[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﵁ বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন

وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ إِلَا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ...الحديث.

অর্থাৎ মালিকানাধীন ও আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন মানত পুরা করা নেই।[১১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ .

অর্থাৎ ইবনে আদমের মালিকানাধীন নয় এমন, আল্লাহর অবাধ্যতায় ও সম্পর্ক ছিন্নে মানত ও কসম নেই।[১২]

✸ জেনে রাখুন, আল্লাহর অবাধ্যতায় যে মানত হয়ে থাকে তা শয়তানের জন্য। যেমন ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ فَذَلِكَ لِلهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .

অর্থাৎ মানত দু'প্রকার– যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের, তা আল্লাহর জন্য আর তা পূর্ণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যে মানত হবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তা হবে শয়তানের জন্য, তা পূর্ণ করা যাবে না। বরং তার কাফফারা হলো কসমের কাফফারা।[১৩]

[১০] *নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ– সহীহ*
[১১] *আবূ দাউদ, ও হাকেম– হাসান*
[১২] *আবূ দাউদ ও হাকেম– সহীহ*
[১৩] *নাসায়ী– সহীহ*

মানত সম্পর্কিত যা কিছু নিষেধ–

হে মুসলিম, মানত করা বর্জন করুন (মানত পুরাপুরি ছেড়ে দিন) তার কারণ হল–

১। "নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন।"

২। মানত কোন কিছুকে অগ্রসরও করতে পারে না এবং পেছাতেও পারে না।

৩। মানত কোন কিছু ফেরাতে পারে না। যেমন ইবনে উমার ﵁ এর হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ.

অর্থাৎ মানত কোন কিছু অগ্রসর করতে পারে না এবং পেছাতেও পারে না, তবে অবশ্য তা দ্বারা কৃপণের মাল হতে কিছু বের করা হয়।[১৪]

ইবনে উমার ﵁ এর বর্ণিত হাদীসে আছে–

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ.

অর্থাৎ নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, মানত অবশ্যই কিছু করাতে পারে না তবে তা দ্বারা কৃপণের কিছু মাল বের করা হয়।[১৫]

৪। মানত বনী আদমের জন্য কিছুই এনে দিতে পারে না বরং মানত তাকে তাকদীর-ভাগ্যের দিকে নিক্ষেপ করে। যেমন আবূ হুরাইরা ﵁ বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

অর্থাৎ মানত ভাগ্যে যা নেই এমন কিছু বনী আদমের জন্য বয়ে নিয়ে আসে না বরং মানত তাকে সেই ভাগ্যের উপর নিক্ষেপ করে যা তার জন্য নির্ধারিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা কৃপণের মাল বের করে নেন। **(চলবে...)**

[১৪] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[১৫] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*

শিয়াদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকীদাহ

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী★

(শেষ পর্ব)

প্রশ্ন: (১৬) ইসনা আশারীয়া শিয়াদের মতে কীভাবে ও কখন আল্লাহর নিকট দু'আ কবুল হয়?

উত্তর: শিয়াদের শাইখরা মনে করে, তাদের ইমামদের নামের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট দু'আ কবুল হয়।[১৬]

প্রশ্ন: (১৭) শিয়াদের আকীদাহ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা কীভাবে নবীদের দু'আ কবুল করেছেন?

উত্তর: শিয়ারা মনে, নবীগণ যখন তাদের ইমামদের উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন, তখনই কেবল তাদের দু'আ কবুল হয়েছে। ইমাম রেযা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নূহ আলাইহিস সালাম যখন ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলেন, তখন তিনি আমাদের হকের উসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। তখন আল্লাহ তাকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, তখন তিনি আমাদের হকের উসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। ফলে তার জন্য আগুন শান্তিময় শীতল হয়ে গেছে। মূসা আলাইহিস সালাম সাগরে লাঠি মেরে আমাদের উসীলায় দু'আ করেছেন। ফলে আল্লাহ সাগরের মধ্য দিয়ে শুকনো রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। ঈসা আলাইহিস সালামকে যখন ইহুদীরা হত্যা করতে চাইলো, তখন তিনি আমাদের উসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। ফলে তিনি হত্যা থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।[১৭]

প্রশ্ন: (১৮) শিয়াদের আকীদাহ অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কীভাবে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল?

উত্তর: তারা মনে করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উসীলা দিয়েছিলেন, তখনই কেবল চাঁদকে তাঁর জন্য দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল।[১৮]

প্রশ্ন: (১৯) শিয়াদের আকীদাহ অনুসারে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ করা যাবে কি?

উত্তর: শিয়াদের শাইখ মাজলেসী বলেন, ইমামগণ ব্যতীত অন্য কারো কাছে ফরিয়াদ করা যাবে না। কেননা তারাই হচ্ছেন নাজাতের মাধ্যম এবং বিপদাপদের আশ্রয়।[১৯] শিয়াদের শাইখগণ বর্ণনা করেছেন, তাদের কোনো এক ইমাম বলেছেন, আবুল হাসানের মাধ্যমে যালেমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, আলী ইবনুল হুসাইনের মাধ্যমে শাসকদের জুলুম ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। আর মুসা বিন জা'ফরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়, আলী বিন মুসার মাধ্যমে জলে ও স্থলের বিপদ থেকে নিরাপত্তা কামনা করা হয়। মুহাম্মাদ বিন আলীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে রিযিক চাওয়া হয়। হাসান বিন আলী আখেরাতের বিপদাপদের জন্য নির্দিষ্ট।[২০]

প্রশ্ন: (২০) শিয়াদের আলেমদের মতে উলুল আযম তথা সর্বাধিক মর্যাদাবান পাঁচজন রাসূল কীভাবে এত বড় মর্যাদা লাভ করেছেন?

উত্তর: তাদের মতে, উলুল আযম রাসূল তথা নূহ আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহি সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম শিয়াদের ইমামগণকে ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা লাভ করেছেন। শিয়াদের শাইখ মাজলেসী তার কিতাব আনওয়ারুল বিহারে এই মর্মে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়টির নাম হলো, "উলুল আযম রাসূলগণ ইমামদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে উলুল আযম রাসূলে পরিণত হয়েছেন।[২১]

প্রশ্ন: (২১) শিয়াদের নিকট কোনটি উত্তম, তাদের ইমামদের কবর যিয়ারত করা না কি ইসলামের ৫ম রুকন কা'বা ঘরের হজ্জ আদায় করা?

উত্তর: শিয়া শাইখদের মতে, তাদের ইমামদের মাযার ও কবর যিয়ারত করা কা'বা ঘরের হজ্জ করার চেয়ে উত্তম। তারা বর্ণনা করে থাকে যে, ইমাম আবু

★ *সিনিয়র মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী ঢাকা।*

[১৬] *বাসায়িরুদ দারাজাত, পৃষ্ঠা নং- ৬১*
[১৭] *বিহারুল আনওয়ার, (২৬/৩২৫)*
[১৮] *সহীফাতুল আবরার, পৃষ্ঠা নং- ২*
[১৯] *বিহারুল আনওয়ার, (৯৪/৩৭)*
[২০] *বিহারুল আনওয়ার, (৯৪/৩৩)*
[২১] *বিহারুল আনওয়ার, (২৬/২৬৭)*

আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারত করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আদায়কৃত ত্রিশটি পবিত্র ও মাকবুল হজ্জের সমতুল্য।[২২]

তারা আরো বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইনের মাযার যিয়ারত করবে, তার আমলনামায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আদায়কৃত ৭০টি হজ্জের সাওয়াব লিখা হবে। তারা আরো বর্ণনা করে থাকেন, যে ব্যক্তি হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাযার যিয়ারত করবে, তার আমলনামায় ইমাম কায়েমের সাথে আদায়কৃত ১০ লাখ হজ্জের সাওয়াব লিখা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আদায়কৃত ১০ লাখ উমরার সাওয়াব লিখা হবে।[২৩] তারা ইমাম রেযা থেকে বর্ণনা করে থাকে, যে ব্যক্তি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবর যিয়ারত করলো, সে আরশের উপরে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলো।[২৪] শিয়াদের এ ধরনের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এখনো শেষ হয়নি। এভাবে যুগে যুগে তারা মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা করেই চলছে।

প্রশ্ন: (২২) শিয়াদের আলেমদের মতে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হালাল ও হারাম করার অধিকার আছে কি?

উত্তর: তারা দাবি করে থাকে, তাদের ইমাম আবু জা'ফর বলেছেন, আমাদের ইমামদের ওপর হালাল-হারামের দায়-দায়িত্ব সমর্পণ করা হয়েছে। তারা যেটাকে হালাল করেন, সেটাই হালাল এবং তারা যেটাকে হারাম করেন সেটাই হারাম। তাদের ইমাম রেযা থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মানুষ আমাদের দাসের মত।[২৫]

প্রশ্ন: (২৩) হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবরের মাটি সম্পর্কে শিয়াদের আকীদাহ কী?

উত্তর: শিয়াদের আলেমগণ বলেন, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবরের মাটি সমস্ত রোগ থেকে আরোগ্য দানকারী। তারা আরো বলেন, তাতে রয়েছে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা এবং প্রত্যেক ভয়ের নিরাপত্তা।[২৬] তারা আরো বর্ণনা করে যে, তোমরা বরকতের জন্য তোমাদের নবজাতক শিশুর মুখে হুসাইনের কবরের মাটি প্রবেশ করাও। কেননা এতে রয়েছে শিশুর নিরাপত্তা।[২৭] শিয়াদের শাইখ খোমাইনী বলেন, কোন কবরের মাটিই হুসাইনের কবরের মাটির সমান নয়। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য ইমামগণের কবরের মাটিও নয়।[২৮]

প্রশ্ন: (২৪) শিয়াদের মতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা কি বৈধ?

উত্তর: শিয়া শাইখদের আকীদাহ অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া অন্যে কাছে দু'আ করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে তাকে যেন রব্ব বা প্রভু না মনে করা হয়। আয়াতুল্লাহ খোমাইনী বলেন, শির্ক হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট এই বিশ্বাসে দু'আ করা যে, সে মাবুদ ও প্রভু। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মাবুদ ও প্রভু হিসেবে বিশ্বাস না করে অন্যের কাছে প্রয়োজন পূরণের দু'আ করলে শির্ক হবে না। এক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জীবিত ও মৃত সকলের নিকটেই দু'আ করা বৈধ। এমনকি পাথর ও মাটির কাছে প্রয়োজন পূরণের দু'আ করা শির্ক নয়।[২৯] কোনো সন্দেহ নেই যে, এটাই ছিল জাহেলী যুগের মক্কাবাসীদের শির্ক। আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের শির্ক সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, তারা বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না"। (সূরা যুমারঃ ৩)

প্রশ্ন: (২৫) শিয়াদের মতে মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন?

---

[২২] *ছাওয়াবুল আ'মাল পৃষ্ঠা নং- ৫২*
[২৩] *তাহযীবুল আহকাম, (৬/৪৯)*
[২৪] *বিহারুল আনওয়ার, (৯৮/৬৯)*
[২৫] *আল-আমালী, পৃষ্ঠা নং- ৪৮*
[২৬] *আল-আমালী, (১/৩২৬)*
[২৭] *বিহারুল আনওয়ার, (১০১/১২৪)*
[২৮] *তাহরীরুল উসীলা, (২/১৬৪)*
[২৯] *কাশফুল আসরার, পৃষ্ঠা নং- ৩০*

উত্তর: তাদের মতে আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে তাঁর নবীর সাথে আমীরুল মুমিনীন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জবানে কথা বলেছেন।[৩০]

প্রশ্ন: (২৬) শিয়া শাইখদের মতে, আল্লাহ তা'আলা ও তাদের ইমামদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

উত্তর: শিয়া শাইখদের মতে, আল্লাহ তাআলা ও তাদের ইমামদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শিয়া শাইখগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ইমামদের এমন বাতেনী রূহানী চিরন্তন অবস্থা রয়েছে, যাতে তাদের জন্য রুবুবীয়্যাতের গুনাবলী বিদ্যমান। দু'আর মধ্যে শিয়া শাইখগণ বলে থাকে, হে আল্লাহ! তোমার মধ্যে ও ইমামদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে শুধু এতটুকু পার্থক্য আছে যে, তারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা।[৩১]

প্রশ্ন: (২৭) শিয়া শাইখদের মতে, শির্ক বলতে কী বুঝায়? তাদের মতে মুশরকিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার তাৎপর্য কী?

উত্তর: শিয়া শাইখদের মতে, কুরআনুল কারীমের যত স্থানে শির্ক শব্দটি এসেছে, তার প্রত্যেক স্থানেই এর উদ্দেশ্য হলো আমীরুল মুমিনীন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের খেলাফতে অন্য কাউকে অংশীদার করা। যত স্থানে মুশরিক শব্দটি এসেছে, তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি যে আলী রাযিয়াল্লাহু ও তাঁর সন্তানদের খেলাফতে বিশ্বাস করে না এবং খেলাফতের ক্ষেত্রে যে তাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়। তাদের ইমাম আবু জা'ফর থেকে তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণী:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বের নবীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং আল্লাহরই এবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাক"। (সূরা যুমারঃ ৬৫) এর ব্যাখ্যায় বলে থাকে যে, শির্ক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতে অন্য শরীক করা।[৩২] শিয়াদের শাইখ আবুল হাসান আশ-শরীফ বলেন, কুরআনে উল্লেখিত শির্কের ব্যাখ্যা অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলোতে শির্ক বলতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ও ইমামতে অন্য কাউকে শরীক করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: (২৮) শিয়াদের মতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কি গায়েব জানে?

উত্তর: শিয়া শাইখগণ দাবি করেন যে, আলী বিন আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি ১২ বার আমার রবের নিকট গমণ করেছি। প্রত্যেকবারই তিনি আমাকে তার মারেফত দান করেছেন এবং আমাকে গায়েবের চাবিকাঠি প্রদান করেছেন।[৩৩] তারা আরো দাবি করে যে, তাদের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমি আসমান-যমীনের সবকিছু জানি। জান্নাতের মধ্যে যা কিছু আছে, তা জানি এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা জানি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে, তাও জানি।[৩৪] অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জল ভাগের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্যদানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।"[৩৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

---

[৩০] *শারহুয যিয়ারাহ আল-জামিআ, (২/১৭৮)*
[৩১] *মাসাবীহুল আনওয়ার, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীছ নং- ২২২*
[৩২] *তাফসীরু ফুরাত, পৃষ্ঠা নং- ৩৭০*
[৩৩] *তাফসীরু ফুরাত, পৃষ্ঠা নং- ৬৭*
[৩৪] *বিহারুল আনওয়ার, (২৬/১১১)*
[৩৫] *সূরা আন'আম আয়াত: ৫৯*

"হে নবী! তুমি বলে দাও, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না।[৩৬]

প্রশ্ন: (২৯) শিয়াদের মতে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো রব্ব বা প্রভু আছে কি?

উত্তর: শিয়া শাইখগণ বলে থাকে যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রবের অংশ বিশেষ। তারা তাদের গোমরাহীর সাগরে আরো নিমজ্জিত হয়ে বলে থাকে যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমিই যমীনের রব। আমার মাধ্যমেই যমীন শান্ত হয়।[৩৭]

প্রশ্ন: (৩০) শিয়া শাইখদের মতে দুনিয়া ও আখেরাতে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা হাতে?

উত্তর: শিয়া শাইখগণ আবু বাসীরের সূত্রে আবু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি কি জান না যে, দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমতা ইমামের হাতেই, তিনি যেখানে এটা রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা এটা দেন?[৩৮] অথচ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ () قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ () سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ () قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ যদি তোমরা জানো তাহলে বলোঃ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বসবাস করছে তারা কার? তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলোঃ তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করোঃ সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ। বলোঃ তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করোঃ যদি তোমরা জেনে থাকো তাহলে বলোঃ কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব? আর কে তিনি, যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মুকাবেলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ এ বিষয়টি আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। বলোঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?"[৩৯] আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾

"হে নবী! তুমি জিজ্ঞাসা করো, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে কে রুযী দান করেন? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তুমি বলো, তারপরও কি তোমরা ভয় করবে না?[৪০] কুরআন মাজীদে এরকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

পরিশেষে সকল পাঠকের কাছে শিয়াদের এসব বাতিল আকীদাহ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সতর্ক করার আহবান জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, হে আল্লাহ! তুমি এই ভ্রান্ত ও বাতিল ফিরকাহ থেকে আমাদের দ্বীনকে হেফাযত করো। আমীন।

নবী ﷺ বলেন:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

"যে জাতির মধ্যে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিবে, তাদের মধ্যে মহামারিসহ এমন কঠিন রোগ দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে ছিল না।"

(সুনান ইবনে মাজাহ হা: ৪০১৯)

[৩৬] *সূরা নামল আয়াত: ৬৫*
[৩৭] *মিরআতুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা নং -৫৯*
[৩৮] *উসূলুল কাফী, (১/৪০৯)*
[৩৯] *সূরা মুমিনূন আয়াত: ৮৪-৮৯*
[৪০] *সূরা ইউনুস আয়াত: ৩১*

খলীফা ও খেলাফতের হাকীকাত

মুফতি মো: আব্দুর রউফ বিন মো: আইয়ুব আলী মাদানী ★

খেলাফাতের সংজ্ঞা : শাব্দিক অর্থে খেলাফাত (خلافة) শব্দটি খালাফা (خَلَفَ) শব্দের ক্রিয়ামূল (মাছাদার) যার অর্থ: স্থলাভিষিক্ত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা, একজন অন্যজনের জায়গায় হওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী:

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي.

আর মুসা তার ভাই হারুনকে বললো: তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও আমার গোত্রের মাঝে।[৪১]

খেলাফতকে ইমামতও বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে : খেলাফত

(১) ঐতিহাসিক আহমাদ আলফাজারী বলেন:

الخلافة: الزعامة الْعُظْمَى وَهِي الْوِلَايَة الْعَامَّة على كَافَّة الْأمة وَالْقِيَام بأمورها والنهوض بأعبائها.

খেলাফত হলো সর্ববৃহৎ দায়িত্ব পালন, তথা সমগ্র উম্মাতের ওপর নেতৃত্ব প্রদান করা, তাদের সমস্ত বিষয় সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং তাদের বোঝাসমূহ বহন করা।[৪২]

(২) আল্লামা তাফতাসনী বলেছেন:

هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

খেলাফত হলো নবী ﷺ-এর প্রতিনিধিত্ব করে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করা[৪৩]

উপরের সংজ্ঞাদ্বয় থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, খেলাফত হলো আল্লাহর মনোনীত ধর্ম রক্ষায় ও দুনিয়া শাসনে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া।

◈ **খলীফা শব্দের অর্থ :** আরবী ভাষার শব্দ খলীফার অর্থ নিয়ে আরবী ভাষাবিদগণ দুই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন যথা: (১) কিছু ভাষাবিদ বলেন: খলীফা অর্থ: এমন ব্যক্তি যার প্রতিনিধিত্ব করে বা যার স্থলাভিষিক্ত হয় তার পরবর্তী প্রজন্ম। আর এ অর্থে আল্লাহর বাণী

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

এর মাঝে খলীফা হলেন আদম ﷺ। তাদের মতে আদম ﷺ সর্বপ্রথম দুনিয়া আবাদ করেছেন এবং তারপর তার সন্তানরা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

(২) আবার কিছু ভাষাবিদ বলেছেন: খলীফা হলেন এমন ব্যক্তি যিনি তার পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

এদের বক্তব্য অনুপাতেও আয়াতে খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য আদম। তাদের মতে, আদমের পূর্বে দুনিয়াতে ছিল জিন বা ফেরেশতা এবং পরবর্তীতে তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আর এ মতের আলোকেই আবু বকর ﷺ-কে বলা হতো খলীফাতু রসূলিল্লাহ বা রসূলের খলীফা। এদের প্রবক্তা ছিলেন, আবু জাফর আন নাহহাস, আল মাওয়াবদী, ইমাম বগবী। তবে উমর ﷺ-এর উপর খলীফা শব্দটি উভয় অর্থেই প্রয়োগ হতে পারে, যেমনটি বলেছেন ভাষাবিদ আন নাহহাস।[৪৪]

খলীফা শব্দটি একবচন, এর বহুবচন আসে তিনটি রূপে, খুলাফা, খালাইফা, খিলাফ।

মনে রাখতে হবে, পরিভাষাতে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তাকে খলীফা বলা হলেও, আল-কুরআনে এক জাতির পরে আগত অন্য জাতিকে আল্লাহ খলীফা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

আর তোমরা স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে নুহের কওমের পর খুলাফা তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।[৪৫]

★ *উস্তাযুল ফিকহ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী।*

[৪১] *সূরা আরাফ আয়াত: ১৮২, দেখুন: মাআছিরুল ইনাফাহ ফি মাআলিমিল খিলাফা-পৃ:১/৮*

[৪২] *দেখুন: মাআছিরুল ইনাফাহ ফি মাআলিমিল খিলাফা পৃ: ১/৮-৯*

[৪৩] *নেহায়াতুল মুহতাজ (৭/৪০৯), হাশিয়া ইবনে আবেদীন-পৃ: ১/৫৪৮*

[৪৪] *দেখুন: মাআছিরুল ইনাফাহ ফি মাআলেমুল খিলাফা -পৃ: ১/১০*

[৪৫] *সূরা আরাফ আয়াত: ৬৯*

তিনি আরো বলেন: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

আর তিনিই তো তোমাদেরকে জমীনের খালাইফ তথা একের পর এক আবির্ভূত জাতি বানিয়েছেন।[৪৬]

তিনি আরো বলেছেন: وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

আর তিনি তোমাদিগকে করবেন পৃথিবীতে খুলাফা তথা একের পর এক আগত জাতি।[৪৭]

তিনি আরো বলেন : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً আমি পৃথিবীতে তৈরি করব খলীফা।[৪৮]

তিনি আরো বলেন:

﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

অচিরেই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং পৃথিবীতে তাদের স্থলে তোমাদের অধিষ্ঠিত করবেন এপর দেখবেন তোমরা কী কাজ করতেছো।[৪৯]

উপরের আয়াতগুলোর আলোকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পৃথিবীতে এক জাতির পর আগত অন্য জাতিকে খলীফা বলা হয়।

◈ কাকে খলীফা বলা যাবে?

সালাফী ইমামদের একদল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইমাম আহমাদ মত দিয়েছেন, আলী ﷺ-এর পুত্র হাসানের পরবর্তী কোন মুসলিম জাহানের শাসকের উপর খলীফা নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তিনি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত সাফিনার হাদীস: রসূল ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে খেলাফত চলবে ত্রিশ বছর, তারপর আসবে রাজতন্ত্র।

বর্ণনাকারী সাঈদ বিন জাহমান বলেন: এরপর সাফীনা আমাকে বললেন: আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী ও হাসানের খেলাফতকাল গণনা কর। আমরা হিসাব করে পাইলাম ত্রিশ বছর। সাঈদ বলেন, আমি তাকে বললাম, বনু উমাইয়ারা তো দাবি করছে যে, খেলাফাত তাদের মাঝে। তিনি বললেন: বনু যারকা (অর্থাৎ উমাইয়াবা) মিথ্যা বলেছে, তারা খলীফা না, তারা হল রাজা, বাদশা নিকৃষ্টতম রাজা বাদশা।

তবে ইসলামের শুরুর দিকে এবং তার পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ প্রচলন নীতির আলোকে খলীফা বলা হতো এমন এক নেতাকে যিনি সর্বোতভাবে মুসলমানদের কার্য সম্পাদন করতেন। তবে সালাফদের অনেকে খলীফা শব্দটিকে কেবল এমন নেতার ক্ষেত্রে প্রয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন যিনি ন্যায় ও সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বর্ণিত আছে, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব একদা তালহা, যুবাইর, কা'ব ও সালমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, খলীফা এবং মালিকের মধ্যে পার্থক্য কী? তালহা ও যুবাইর বললেন: আমাদের জানা নেই। অতঃপর সালমান বললেন: খলীফা হলেন তিনি যিনি প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করেন, তাদের মাঝে সুষম বন্টন করেন, পরিবারের সদস্যদের মত, সন্তানের মত প্রজাদের উপর দরদ দেখান, তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করেন। সালমানের জবাব শুনে কা'ব বলে উঠলেন : আমি ধারণা করিনি যে, এ মজলিসে কেউ খলীফা ও মালিকের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সালমানের উপর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইলহাম করেছেন।

এখানে খলীফার যে বিশেষ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এ অর্থেই অনেকে আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর উক্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার উক্তিটি হল, জনৈক গ্রাম্য লোকটি তাঁকে বললেন: আপনি রসূল ﷺ-এর খলীফা। তিনি বললেন: না আমি তা নই। মরুবাসী বললেন: তবে আপনি কী? তিনি বললেন: أنا الخالفة بعده আমি তার পরবর্তী খালেফা বা তাঁর পশ্চাৎগামী।[৫০]

এ ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনুল আসীর বলেন: যখন গ্রাম্য লোকটি তাকে বলেছিলেন, আপনি রসূল ﷺ-এর খলীফা তখন তিনি অত্যন্ত বিনয় প্রদর্শন করে এবং আত্মিত্বকে হজম করে তার এ উক্তিটি তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

---

[৪৬] *সূরা আনআম আয়াত: ১৬৫*
[৪৭] *সূরা নামল আয়াত: ৬২*
[৪৮] *সূরা বাকারা আয়াত: ৩০*
[৪৯] *সূরা আরাফ আয়াত: ১২৯*
[৫০] *মাআছিরুল ইনাফাহ ফি মাআলেমুল খিলাফা -পৃ: ১/১৩-১৪*

অর্থাৎ, খলীফা সেই যে প্রস্থানকারীর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তার অভাব পূরণ করে। অন্যদিকে খালেফা হলো এমন ব্যক্তি যার মাঝে না আছে কোন উপকার, না আছে কোনো কল্যাণ।[৫১]

তবে ইমাম বাগাভী রাহিমাহুল্লাহ মুসলিম জগতের শাসককে খলীফা বলার পক্ষপাতী, যদিও সে ন্যায় পরায়ণ শাসকদের কিছু আদর্শের বিরোধী হয়।[৫২]

◈ মুসলিম জগতের শাসক কার খলীফা:

আমরা পূর্বে অবগত হয়েছি যে, খলীফা মানে প্রতিনিধি, যিনি অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। এখন এখানে আমরা জানবো যে, একজন মুসলিম শাসক বা নেতা কার খলিফা।

মুসলিম শাসক কার খলিফা এ বিষয়ে আলেমগণ তিনটি মত উল্লেখ করেছেন। যথা:

প্রথম মত: খেলাফত হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। অতএব খলীফা হলেন আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি।[৫৩]

এ মতটির প্রবক্তা অল্প সংখ্যক কিছু আলেম।

তাদের যুক্তি প্রমাণ হলো: মূলত একজন শাসকই সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর অধিকার কায়েম করে। তাছাড়া আল্লাহ বলেছেন: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।[৫৪]

তবে অধিকাংশ আলেম বলেছেন, শাসককে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি বলা জায়েয নয়। তারা বলেছেন, এরূপ বলাটা পাপাচার এবং যারা বলে তারা পাপী।

তারা যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রতিনিধিত্ব করা হয় এমন ব্যক্তির যিনি অনুপস্থিত থাকেন বা মৃত্যুবরণ করেন, অথচ আল্লাহ না অনুপস্থিত হন, না তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তাছাড়া আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হয়েছিল, হে আল্লাহর খলীফা, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা।[৫৫]

আবার কোন কোন আলেম বলেছেন: আল্লাহর খলীফা কেবল আদম ও দাউদ ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না। আদমকে আল্লাহর খলীফা বলা যাবে কারণ আল্লাহ আদম সম্পর্কে বলেছেন:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

আর দাউদকে আল্লাহর খলীফা বলা যাবে, কারণ আল্লাহ বলেছেন:

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি।[৫৬]

আমি মনে করি: আদম ও দাউদকে আল্লাহর খলীফা বলার অর্থ এই নয় যে, তারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী বরং এর অর্থ হল যে, তারা দুজন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত খলীফা।

আবার কিছু আলেম বলেছেন: খলীফাতুল্লাহ বা আল্লাহর খলীফা নামটি সকল নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৫৭]

ইমাম নববী বলেছেন: মুসলমানদের শাসককে আল্লাহর খলীফা বলা উচিৎ নয় বরং তাকে বলা যেতে পারে খলীফা বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা বা আমীরুল মুমিনীন।[৫৮]

এক ব্যক্তি ওমর বিন আব্দুল আযিযকে বললেন: হে আল্লাহর খলীফা। ফলে তিনি তাকে বললেন: তুমি একটা অসম্ভব শব্দ প্রয়োগ করলে! ধ্বংস হও তুমি। আমার মা আমার নাম রেখেছেন ওমর, তুমি আমাকে এ নামে ডাকলে আমি তা মানতাম। এরপর আমি বড় হয়েছি বিধায় আমার কুনিয়াত আবু হাফস, আমাকে এ কুনিয়াত দিয়ে ডাকলেও আমি মেনে নিতাম। এরপর তোমরা আমাকে তোমাদের দায়িত্বশীল বানিয়েছ বিধায় আমাকে তোমরা আখ্যায়িত করেছ, আমিরুল মুমিনীন নামে। তাই এ নামে ডাকলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো।[৫৯]

দ্বিতীয় মত: খেলাফত হলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধিত্ব। তাই খলিফা হলো রসূলের প্রতিনিধি, কেননা সে নবীর উম্মতের মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাছাড়া এ মতের পক্ষে বড় দলীল হলো,

---

[৫১] *ইবনুল আসীর (আন নেহায়া: ২/৬৯)*
[৫২] *মাআছিরুল ইনাফাহ-পৃ: ১/১৪, শারহে সুন্নাহ বাগাবী-পৃ: ১৪/৭৫*
[৫৩] *দেখুন: মাআছিরুল ইনাফাহ ফি মাআলিমিল খিলাফা -পৃ: ১/১৪*
[৫৪] *দেখুন: আল আহকাম আস সুলতানিয়া-লিল মাওয়ারদী পৃ: ৩৭*
[৫৫] *দেখুন: আল আহকাম আস সুলতানিয়া-লিল মাওয়ারদী পৃ: ৩৯*
[৫৬] *সূরা ছোয়াদ আয়াত: ২৬, দেখুন: আস সিয়াসা আশ শারইয়া পৃ: ৪৬২, ইমাম নাওয়াবীর আযকার পৃ: ৫৭০*
[৫৭] *দেখুন: আস সিয়াসা আশ শারইয়া-পৃ: ৪৬২, তাফসীরে যামাখশারী-পৃ: ১/১২৪*
[৫৮] *দেখুন: আল আযকার-পৃ: ৩৬০*
[৫৯] *শারহে সুন্নাহ বাগাবী-পৃ: ১৪/৭৬*

জনৈক ব্যক্তি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সম্বোধন করে বললেন: হে আল্লাহর খলীফা। তিনি জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খলিফা। আর এটাতেই আমি খুশী।[৬০]

তাছাড়া সাহাবীগণ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফাতু রসূলুলিল্লাহ বা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খলীফা বলে সম্বোধন করতেন। আবু বারযাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তির ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। তখন আমি তাকে বললাম: হে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খলীফা, লোকটি কে? তিনি বললেন: কেন? আমি বললাম, আমি তার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিব যদি আপনি হুকুম দেন। তিনি বললেন: তুমি কি সত্যই তা করতে? আমি বললাম: জ্বী হ্যাঁ।

আবু বারযাহ বললেন: আল্লাহর শপথ, আমার এ কঠিন কথা তার ভীষণ রাগকে দূরীভূত করে দিয়েছিল। অতঃপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর কারো জন্য এটার হুকুম দেওয়া শোভনীয় নয়।[৬১]

ইমাম আহমাদ বলেছেন: অর্থাৎ আবু বকরের জন্য উচিৎ নয় যে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত তিনটি কারণ ব্যাতীত কাউকে হত্যা করবেন। কারণ তিনটি হলো: ঈমান আনার পর কাফের হওয়া, বিবাহের পর ব্যভিচার করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা। তবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য এ তিনটি কারণ ছাড়াও কাউকে হত্যা করার অধিকার ছিল।[৬২]

তবে খলীফাতু রসূলিল্লাহ উপাধীটা কেবলমাত্র আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপরই ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া এটা অন্য আর কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়নি। এজন্য তার ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় মত : খেলাফত হচ্ছে পূর্ববর্তী শাসকের প্রতিনিধিত্ব। তাই একজন মুসলিম শাসক তার পূর্ববর্তী শাসকের খলীফা বা প্রতিনিধি।[৬৩]

এ মতের স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করলেন এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাসক নিযুক্ত হলেন, তখন সাহাবীরা তাকে বলতেন, খলিফাতু রসূলিল্লাহ। অতঃপর যখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুবরণ করলেন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাসক নিযুক্ত হলেন এবং সাহাবীরা তাকে বললেন: খলীফাতু খলীফাতি রসূলিল্লাহি অর্থাৎ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খলীফার খলীফা, তখন তিনি বললেন: এটা তো অনেক লম্বা। আবার আমি মারা গেলে আমার স্থানে যে আসবে, তোমরা তাকেও বলবে রসূলের খলীফার খলীফা। অতঃপর তিনি সাহাবীদেকে বললেন: তোমরা মুমিন, আর আমি তোমাদের আমীর। এরপর তিন নিজেকে আখ্যায়িত করলেন আমীরুল মুমিনীন হিসেবে।[৬৪]

পর্যালোচনা: পূর্বের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, মুসলিম জাহানের কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রের শাসককে খলীফা বলার অর্থ হলো, সে পূর্ববর্তী শাসকের স্থলাভিষিক্ত এবং খেলাফাতের অর্থ হলো দেশ শাসনে পূর্ববর্তী শাসকের স্থলভিষিক্ত হওয়া। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসককে যেমন খলীফা নামে আখ্যায়িত করা যায় তেমনি তাকে "আমীরুল মুমিনীন" খালাফাতুন মুসলিমীন "অলিয়্যুল আমর" "মালিক" "ইমাম" "রাজা" "বাদশাহ" "প্রধানমন্ত্রী"' ইত্যাদি উপাধীতেও আখ্যায়িত করা যায়। আর এজন্যই উমাইয়া রাজ বংশের মালিক তথা রাজাদেরকে খালীফা বলা হয়ে থাকে।

একইভাবে মুসলমানদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণকে যেমন খেলাফত বলা হয়, তেমনি সেটাকে হুকম, মুলক ইত্যাদিও বলা হয়।

আর তাই যারা মনে করে খেলাফাত বৈধ আর রাজত্ব অবৈধ, তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। আর এই ভ্রান্তি থেকেই মুসলমানদের একদল সউদী আরবের শাসকদের দেশ শাসন তথা রাজত্বকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে থাকে এবং তারা সেটাকে অপসারণ করে খেলাফাত কায়েমের কথা বলে। অথচ দুটো একই জিনিস।

আমরা পূর্বে আলোচনা থেকে আরো বুঝলাম যে, খলীফা বলতে আল্লাহর প্রতিনিধি বোঝানো সঠিক নয়। অনুরূপভাবে খলীফা বলতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিনিধি বোঝানোটাও সঠিক নয়। বরং খলীফা বলতে উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের শাসক। মুসলমানদের শাসককে আমরা খলীফাই বলি অথবা মালিকই সেটা মূখ্য নয়। মূখ্য বিষয় হলো যিনি মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত হবেন তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এবং শারঈ পরিচালনা নীতির আলোকে জনগণের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ বিধানে কাজ করবেন। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

---

[৬০] *আসার টিকে ইবনু আবি শায়বাহ তার মুসান্নাফ কিতাবে মুসাল সুত্রে ইবনু আবি মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন (৭/৪৩২) মুসনাদে আহমাদ-পৃ: ১/১৯০*

[৬১] *নাসায়ী (৭/১০৯) আলবানী সহীহ বলেছেন।*

[৬২] *আবূ দাউদ- পৃ: ৬/৪১৯*

[৬৩] *দেখুন: মাআছিরুল ইনাফাহ ফি মাআলেমুল খিলাফা -পৃ: ১/১৭*

[৬৪] *তারীখুল মদীনা-পৃ: ২২/৬৭৮*

বিদ'আত পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক*

(২৭তম পর্ব)

◈ **একটি সংশয় ও সমাধান :** যারা মনে করেন যে, নাবী ﷺ কবরে জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর কবরে জীবিত থাকাটা ইহজগতের জীবিত থাকার মতোই আর তিনি তাঁর কবর থেকে উম্মাহর যাবতীয় প্রয়োজন ও ডাকে সাড়া দেন, এছাড়াও ইহজাগতিক প্রয়োজন মেটান এবং প্রয়োজনীয় উপকার করে থাকেন, তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন।

হাদীস নং- ০১:

الْأَنْبِيَاء أَحيَاء فِي قُبُورهم يصلونَ

নাবীগণ তাদের কবরে জীবিত ও সালাত আদায় করেন।[৬৫]

হাদীস নং-০২:

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন:

مَا من أحـد يـسلم علي إِلَّا رد الله علي روحي حَـتَّى أرد عَلَيْهِ السَّلَام

কোনো মানুষ আমার উপর সালাম দিলে আল্লাহ তা'আলা আমার রুহকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আমি সালামের উত্তর দেই।[৬৬]

হাদীস নং- ৩: আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন:

مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره

আমি ঊর্ধ্বগমণের রাতে লাল বালুর স্তূপের নিকট মুসা আলাইহিস সালাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন তিনি তার কবরে দাঁড়িয়ে সালাতরত ছিলেন:[৬৭]

উল্লেখিত হাদীস الكثيب الأحمر বা লাল বালুর স্তূপ এটা বাইতুল মাকদিসের নিকটবর্তী একটি স্থান, যেখানে মূসা আলাইহিস সালাম ইনতিকাল করেছিলেন এবং সেখানেই তাকে দাফন দেয়া হয়েছে।[৬৮]

হাদীস নং- ৪:

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন:

وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ "[৬৯]

আমি নিজেকে নাবীদের একটি জামা'আতের মধ্যে দেখলাম, দেখি মূসা আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন, তিনি শানূয়াহ গোত্রের লোকজনের মতো মধ্যমাকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তার মাথার চুলগুলো কোকড়ানো ছিলো। এরপর ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে সালাতরত অস্থায় দেখলাম। তাঁর আকৃতি প্রায় উরওয়াহ বিন মাসউদ আসসাক্বাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো। এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে সালাতরত অবস্থায় দেখলাম, তার অবয়ব তোমাদের সাথীর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, নাবী ﷺ এখানে নিজের কথাই বলেছেন। অতঃপর সালাতের সময় হয়ে গেল এবং আমি তাদের ইমামতি করলাম। সালাত শেষ হলে কেউ একজন বললো: হে মুহাম্মাদ ﷺ ইনি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক, তাকে সালাম করুন, আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম। এরপর তিনি আমাকে আগে সালাম করলেন।[৬৯]

---

* *মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।*

[৬৫] *সহীহুল জামী-২৭৯০, মাজমাউয যাওয়াইদ-১৩৮১২*

[৬৬] *আবূ দাউদ হা: ২০৪১, সিলসিলাহ সহীহ-২২৬৬*

[৬৭] *সহীহ মুসলিম হা: ২৩৭৫*

[৬৮] *দেখুন সহীহ বুখারী হা: ১৩৩৯*

[৬৯] *সহীহ মুসলিম হা: ১৭২*

এ হাদীসগুলো থেকে তারা দলীল গ্রহণ করে যে, সকল নাবীগণ তাদের কবরে জীবিত ও তাদের জীবন দুনিয়ার জীবনের মতোই। এর ফলে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে একটি সংশয় সৃষ্টি হয় এবং নাবী ﷺসহ সকল নাবীর ওপর একটি ভাল বিশ্বাস আরোপিত হওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এ সংশয়ের সমাধান অত্যন্ত জরুরি।

হাদীসগুলোর পর্যালোচনা ও সংশয়ের সামাধান:

প্রথমত: উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা বারযাখী জীবন উদ্দেশ্য। ইহজগতের সাথে এ হাদীসেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বারযাখ হলো ইহজগত ও পরজগতের মধ্যবর্তী একটি জগত, যার সাথে দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক ও যোগাযোগ নেই, আখিরাতেরও কোনো সম্পর্ক ও যোগাযোগ নেই। এটা দুনিয়া ও আখিরাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা জগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা এটা উপলব্ধি করতে পারো না।[৭০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের পক্ষ হতে তারা রিযিকপ্রাপ্ত।[৭১]

বারযাখী জীবনে আল্লাহর পথে শহীদরা জীবিত, তাদের জীবিত থাকাটা দুনিয়ার জীবনের মতো নয়।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন:

«أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً» ، فَقَالَ: " هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا "

আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিদের রুহসমূহ সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দিপাধারে বাস করে। তারা জান্নাতের যেখানে খুশি সেখানে বিচরণ করার পর সেই দিবাধাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দিকে সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: তোমাদের কি কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে? উত্তরে তারা বলবে: আমাদের আবার কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তিনবার এরূপ করলেন। যখন তারা দেখলো যে, কিছু না বললে প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ হয়তো আল্লাহ তা'আলা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন)। তখন তার (শহীদানরা) বললো: হে আমাদের রব! আমাদের আত্মাগুলোকে আমাদের দেহসমূহে ফিরেয়ে দিন যাতে আমরা আবারো আপনার পথে শহীদ হতে পারি।

এবার আল্লাহ তা'আলা যখন দেখবেন তাদের কোনো চাহিদা বা প্রয়োজন নেই তখন তাদেরকে (নিজেদের অবস্থায়) ছেড়ে দেওয়া হবে।[৭২] আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ঘোষিত শহীদগণের জীবিত থাকা ও তাদের রিযিক পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি জীবিত থাকা বলতে বারযাখী জীবনের কথা বুঝানো হয়েছে যা মোটেও দুনিয়ার জীবনের মতো নয়, তাই যদি হতো তাহলে শহীদদের আত্মাগুলো তাদের দেহে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করতো না।

এ মর্মে নাবী ﷺ আরো বলেন:

[৭০] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৫৪*
[৭১] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৬৯*
[৭২] *সহীহ মুসলিম হা: ১৮৮৭*

«إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ»

মুমিন ব্যক্তির রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতে বৃক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। অবশেষে পূনরুত্থানের দিনে রূহ তার দেহে ফিরে আসবে।[৭৩]

অতএব শহীদ ও মুমিনদের আত্মা দাফনকৃত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে আত্মাগুলোকে দেহের সঙ্গে জুড়ে দিবেন।

সুতরাং সকল ঈমানদারগণ তথা নাবী রসূল-শহীদানরা ও সকল সাধারণ মুমিনরা বারযাখী জীবনে জীবিত, তাদের আত্মাগুলো ইল্লীয়ীনে সংরক্ষিত। যার প্রকৃতরূপ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ অবগত নয়। আর এটা মোটেও দুনিয়ার জীবনের মৃত্যু নয়।

তবে বারযাখী জীবনে যেমন শহীদানরা বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত; তাদের রূহগুলো জান্নাতে সবুজ পাখির উদরে সংরক্ষিত থেকে জান্নাতের সর্বত্র বিচরণ করে। ঠিক তেমনি নাবী-রসূলগণও বারযাখী জীবনে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত ও নিয়ামতপূর্ণ এবং বিশেষ সম্মানে অলঙ্কৃত। (আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

দ্বিতীয়ত: যারা নাবী ﷺ-এর তার কবরে জীবিত থাকার প্রতি বিশ্বাস করে। তাদের আরো দাবি হলো নাবী ﷺ কবরে থেকে সব মানুষের কথা শুনতে পান এবং যারা তার প্রতি দরূদ পড়ে, নাবী ﷺ তাদের দরূদ ও সালামের উত্তর দেন।

দলীল হিসাবে তারা উল্লেখিত চারটি হাদীসের দ্বিতীয় হাদীসকে উপস্থাপন করে থাকে। সেই সাথে আরো একটা হাদীস উল্লেখ করে থাকে;

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন:

من صلى عليَّ عند قبري سمعته

যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়ে, তার দরূদ শুনতে পাই।[৭৪]

এ হাদীসের ভিত্তিতে সূফিবাদীদের বিশ্বাস হলো নাবী ﷺ কবরে থেকে মানুষের কথা ও তার উপর প্রেরণকৃত দরূদ ও সালাম শুনেন এবং জবাব দেন।

সে ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হলো নাবী ﷺ যদি কবরে জীবিতই না থাকবেন তাহলে দরূদ ও সালাম শুনেন কীভাবে এবং উত্তরই বা দেন কীভাবে?

এর উত্তরে আমরা বলবো; মৃত ব্যক্তিরা সাধারণত জীবিত ব্যক্তিদের আহ্বান শুনতে পাবে না। কারণ মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে দুনিয়ার জীবিত ব্যক্তিদের কোনো সংযোগ বা যোগাযোগ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

যারা কবরে রয়েছে আপনি তাদেরকে শুনাতে পারবেন না।[৭৫]

সুতরাং মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের কোনো কথা শুনতে পায় না।

এছাড়া নাবী থেকে এমন কোনো বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ কবরে থেকে মানুষের আহ্বান শুনতে পান।

আর উল্লেখিত হাদীসটি; من صلى عليَّ عند قبري سمعته আমার কবরের নিকট এসে যে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি তা শুনতে পাই- এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়।[৭৬]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ) বলেন: উক্ত হাদীসটি জাল। কারণ এ হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী আমাশ (রাহ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এ মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদ্দী সর্বসম্মতিক্রমে একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী। সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনাটি মাওযূ বা জাল।[৭৭]

অন্যদিকে আবু দাউদে হাসান সূত্রে যে বর্ণনাটি রয়েছে নাবী ﷺ বলেছেন:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

কোনো মানুষ আমার উপর সালাম দিলে আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে ফিরিয়ে দেন, অতঃপর আমি তার সালামের উত্তর দেই।[৭৮]

---

[৭৩] *সুনান ইবনু মাজাহ হা: ৪২৭১, মুসনাদ আহমাদ হা: ১৫৭৭৭,১৫৭৭৮*
[৭৪] *আল হায়াতুন আম্বিয়া লিল বাইহাকী-৪৬, শুআবুল ঈমান হা: ১৪১৮*
[৭৫] *সূরা ফাতির আয়াত: ২২*
[৭৬] *দেখুন: আল মাউযুআত লি ইবনিল জাওযী ১ম খণ্ড- ৩০৩ পৃ:*
[৭৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া-২৭ খণ্ড, ২৪১ পৃ:*
[৭৮] *আবূ দাউদ হা: ২০৪১, সিলসিলাহ সহীহা হা: ২২৬৬*

এ হাদীসটি মোটেও নাবী ﷺ-এর সরাসরি কোনো মুসলিমের দেয়া সালাম শোনা প্রমাণ করে না। বরং তার দেহে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর আত্মা ফেরত আসার প্রতি মুখাপেক্ষী এ বিষয়টাই উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা ইল্লীয়ীন থেকে তার রূহকে তাঁর দেহের সঙ্গে জুড়ে না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কারো সালাম শুনতে পান না এবং জবাবও দিতে পারেন না।[৭৯]

তৃতীয়ত : নাবী ﷺ মিরাজ রাত্রিতে মূসা ﷺ-কে বাইতুল মাকদাসের নিকটবর্তী আল-কাসীবুল আহমার বা লাল বালুর স্তূপের নিকট সালাত আদায় করতে দেখেছেন।[৮০]

নাবী ﷺ মিরাজ রাত্রিতে নাবীদের একটি জামা'আতের মধ্য মূসা, ঈসা ও ইবরাহীম ﷺ-কে সালাতরত দেখেছেন।[৮১]

এ দুটো হাদীসকে ব্রেলোভী সূফীরা নাবীদের কবরে জীবিত থাকার পক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করে থাকে।

মূলত এ হাদীস দুটো কোন ক্রমেই নাবীদের কবরে জীবিত থাকার বিষয় কোনো প্রমাণ বহন করে না। কারণ-

(১) উল্লেখিত হাদীস দুটি মিরাজ কেন্দ্রিক আর মিরাজ নাবী ﷺ-এর বৃহৎ মু'জিযাহ। সুতরাং এ রাত্রিতে নাবী ﷺ-এর দেখা সব কিছুই মু'জিযাহ সুতরাং মুসা ﷺ-এর বালুর স্তূপের নিকট সালাতরত অবস্থায় দেখা পাওয়াটা মু'জিযাহর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এটা সকল নাবীদের নিজ নিজ কবরে জীবিত থাকার দলীল নয়।

(২) যে মূসা ﷺ-কে নাবী ﷺ মিরাজের রাত্রিতে বাইতুল মাকদিসের নিকট লাল বালুর স্তূপের নিকট তার কবরের স্থানে সালাতরত দেখলেন, তাকেই আবার তিনি ৬ষ্ঠ আসমানে দেখলেন এবং তার সাথে সালাম বিনিময় ও কুশল বিনিময় করলেন। আবার মূসা ﷺ-কেই নাবীদের এক জামা'আতের মাঝে সালাত পড়তে দেখলেন।

যেখানে নাবী ﷺ সালাতের ইমামতি করলেন এবং জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সালাম বিনিময় করলেন। আবার মিরাজ থেকে ফেরার পথে সেই মূসা ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত-পূর্বক ৫০ ওয়াক্ত সালাত পাঁচ ওয়াক্ত নেমে আসলো যেটা মানবীয় জ্ঞানে অনুধাবন ও উপলব্ধি, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উভয়টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

অতএব সব নাবী কবরে জীবিত এমন একটি শিরকি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিরাজ রাত্রির বিশেষ নিদর্শনমালাকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করাটা একেবারেই জঘন্য ও বেমানান বা নাবী ﷺ-এর ঊর্ধ্বগমণকে অসম্মান করার দাবি রাখে।

আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং আকিদা বিশুদ্ধ করার তাওফীক দান করুন। **(চলবে... ইনশা আল্লাহ)**

কোন কোন খাদ্যে আমরা এন্টি অক্সিডেন্ট বেশী পরীমাণে পাই?

- ▣ সাদা ও সবুজ আঙুরের চেয়ে লাল আঙুরে বেশী পরিমাণেএন্টি অক্সিডেন্ট থাকে।
- ▣ সাদা পিয়াজের চেয়ে লাল ও হলুদ পিয়াজে বেশী এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে।
- ▣ কাঁচা বা অল্প সিদ্ধ ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ব্রোকলিতে এন্টি অক্সিডেন্ট বেশী থাকে।
- ▣ কাঁচা ও ছেঁচা রসুনেও যথেষ্ট পরিমাণে এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে।
- ▣ টিনের সবজি থেকে তাজা বা ফ্রিজে রাখা সবজিতে এন্টি অক্সিডেন্ট বেশী থাকে।
- ▣ আগুনে বা ভাঁপে সিদ্ধ সবজি থেকে মাইক্রোওভেনে সবজি বানালে বেশী এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে।
- ▣ একষ্ট্রা ভারজিন কোল্ড প্রসেসড অলিভ অয়ল এ এন্টি অক্সিডেন্ট বেশী থাকে।
- ▣ সাদা জাম্বুরা থেকে গোলাপী জাম্বুরাতে বেশী এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে।
- ▣ ফলের রসের চেয়ে আস্তো ফলে এন্টি অক্সিডেন্ট বেশী থাকে।
- ▣ টিন বা ক্যানের ফলের রসের চেয়ে তাজা ফলের রস ও ফ্রিজে রাখা ফলের রসে এন্টি অক্সিডেন্ট বেশী থাকে।
- ▣ কমলা, গাজর, মিষ্টি আলু, মিষ্টি কুমড়া ও খিরায় অনেক অনেক এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে।
- ▣ ভিটামিন "ই", "সি" এবং কেরোটিনে এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে। *(ডা:শাহিদা খন্দকার)*

[৭৯] *ফাতাওয়া লাজনা দায়িমাহ ১ম খণ্ড-৪৭২-৪৭৩ পৃ:, মাউসুআতুল ফিরাক্বিল মুন্তাসারা লিল ইসলাম ৯ম খণ্ড-২৮ পৃ:*
[৮০] *সহীহ মুসলিম হা: ২৩৭৫*
[৮১] *সহীহ মুসলিম হা: ১৭২*

ইল্‌ম ও পরহেযগারিতা

মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

আমরা কিভাবে পরহেযগার হতে পারি?

নিশ্চয়ই পরহেযগারিতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নে'মত। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে চান তাকেই পরহেযগারিতা দান করেন। পরহেযগারিতা লাভের কতিপয় কারণ রয়েছে যেগুলো একজন বান্দাকে পরহেযগারিতার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে সহযোগীতা করে। তন্মধ্যে কতিপয় সবাব বা কারণ উল্লেখ করা হলঃ-

নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকাঃ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ تَكُنْ مَنْ أَوْرَعَ النَّاسِ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তা হতে বিরত থাক, তাহলে তুমি বড় পরহেযগার হতে পারবে।[৮২]

দিনার ও দিরহাম বা টাকা-পয়সার দ্বারা ভালোভাবে লেন-দেন করাঃ

شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِشَهَادَةٍ , فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ , وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفُكَ , ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ , قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟ , قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ , فَقَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ؟ , وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ, ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ.

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট একজন লোক এসে কোন একটি বিষয়ে সাক্ষী দিলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে চিনি না। আর আমার না চেনায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি একজন লোক নিয়ে আস যে তোমাকে চেনে। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি হিসাবে চেন? সে বলল, ন্যায়পরায়ণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সে কি তোমার নিকট প্রতিবেশী? তুমি কি তার রাত-দিন, গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত? সে বলল, না। তুমি কি তার সাথে টাকা-পয়সার লেন-দেন করেছ, যা মানুষের পরহেযগারিতার প্রমাণ? লোকটি বলল, না। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি কি তার সাথে কখনোও সফরে সঙ্গী হয়েছিলে, যার মাধ্যমে চারিত্রক মাধুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে জান না। সুতরাং তুমি এমন একজন লোক নিয়ে আস, যে তোমার সম্পর্কে জানে।[৮৩]

সুফিয়ান ছাওরী (রহিমাহুল্লাহু আলাইহি)-কে পরহেযগারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন,

إِنِّي وَجَدْتُ فَلاَ تَظُنُّوا غَيْرَهُ + هَذَا التَّوَرُّعَ عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ. فَإِذَا قَدِرْتِ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهُ + فَاعْلَمْ بِأَنَّ هُنَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

'মনে রেখো, আমি দিরহামের নিকট পরহেযগারিতাকে খুঁজে পেয়েছি। এর বাইরে তুমি অন্য কিছুকে ধারণা কর না'। 'যখন তুমি দিরহাম অর্জনে সক্ষম হলে অতঃপর তা পরিত্যাগ করলে। জেনে রেখো! এখানেই একজন মুসলমানের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা (লুকিয়ে) রয়েছে।[৮৪]

অন্য একজন কবি কবিতা আবৃতি করে বলেন,

لَا يَغُرَّنْكَ مِنَ الْمَرْءِ قَمِيْصُ رَقَعَهْ + أَوْ إِزَارًا فَوْقَ كَعْبِ السَّاقِ مِنْهُ رَفَعَهْ أَوْ جَبِيْنٌ لَاحِ فِيْهِ أَثَرٌ قَدْ قَلَعَهْ + وَلَدَى الدِّرْهَمِ فَانْظُرْ غَيَّهُ أَوْ وَرَعَهْ

'যখন কোন মানুষকে তুমি ছিড়া কাপড় পরিধান করতে দেখবে, তাকে তুমি পরহেযগার মনে করে ধোঁকায় যেন না পড়। অনুরূপভাবে যখন তুমি কোন মানুষকে দেখবে সে (পায়ের) গোড়ালির উপর কাপড়

---

* *দাওরায়ে হাদীস, কামিল-হাদীস, নওগাঁ, দিনাজপুর।*

[৮২] *শু'আবুল ঈমান হা/২০১, ইবনে জাওযী (রহিমাহুল্লাহু আলাইহি) একে ছহীহ বলেছেন।*

[৮৩] *বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা হা/২০১৮৭, [মা.শা হা/২০৯০১]*

[৮৪] *কাযবীনী, মুখতাছার শু'আবুল ঈমান ১/৮৬পৃঃ*

পরিধান করে, তখন তাকে তুমি পরগেযগার ধারণা করে, অথবা তার চেহারার মধ্যে এমন কোন আঘাত রয়েছে যা তার পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী বুঝায়, তা দেখে তুমি যেন ধোঁকায় না পড়। তোমাকে একজন মানুষের পরহেযগারিতা পরীক্ষা করতে হলে, তখন সে তাকে কিভাবে গ্রহণ করে। তখন তার পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী প্রাধান্য পায় নাকি তার গোমরাহি প্রাধান্য পায়।[৮৫]

***আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় যাবতীয় কর্মের উপর হিসাব নিবেন এ কথা স্বরণ করাঃ**

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ عَطَاءَ رَحِمَهُ اللهُ : تُوْلَدُ وَرْعَ الْمُتَوَرِّعِيْنَ مِنْ ذِكْرِ الذَّرَةِ وَ الْخَرْدَلَةِ وَ أَنَّ رَبَّنَا الذِّيْ يُحَاسِبُ عَلَى اللَّحْظَةِ وَ الْهَمْزَةِ وَ اللِمْزَةَ لَمُسْتَقِصٌ فِي الْمُحَاسِبَةِ وَ أَشَدُّ مِنْهُ أَنْ يُحَاسِبَهُ عَلَى مَقَادِيْرُ الذَّرَةِ وَ أَوْزَانُ الْخَرْدَلَةِ وَ مَنْ يَكُنْ هَكَذَا حِسَابَهُ لَحَرِّي أَنْ يَتَقَى

আবুল আব্বাস বিন আত্বা রহিমাহুল্লাহ বলেন, পরহেযগার ব্যক্তির পরহেযগারিতা সৃষ্টি বা তৈরি হয়, শস্য দানা বা অনুকনাকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তাকে জানতে হবে, আমাদের রব যিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ভালো ও মন্দ কর্ম বিষয়ে হিসাব নিবেন। তিনি আমাদের হিসাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দিবেন না এবং আমাদের হিসাবে কঠোরতা করবেন। তার চেয়ে আরো কঠিন ব্যাপার হল, তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে অনুকণা পরিমাণ বা শস্য দানার ওজনের সমপরিমাণ বিষয়ে ও হিসাব নিবেন। সুতরাং যে বান্দার হিসাবের এ অবস্থা হবে তাকে অবশ্যই হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আমাদের যাবতীয় কর্মের হিসাব নিবেন সেদিনের জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাদের অবশ্যই দুনিয়াতে পরহেযগার হতে হবে। হালাল হারাম বেঁচে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।[৮৬]

***আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করাঃ**

আবু আব্দুল্লাহ আ-ইনত্বাকী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ' اَلْخَوْفُ يَكْسِبُ الْوَرْعَ' 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার মাধ্যমে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অর্জিত হয়।

***আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস করা এবং মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার প্রতিক্ষা করাঃ**

قَالَ يَحْيَى بْنِ مَعَاذٍ رَحِمَهُ اللهُ : اَلْوَرْعُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ مِنْ عِزِّ النَّفْسِ وَصِحَّةِ الْيَقِيْنِ وَتَوَقَّعُ الْمَوْتِ

ইয়াহইয়া ইবনে মা'আয রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনটি অভ্যাসের চর্চা দ্বারা পরহেযগারিতা অর্জিত হয়। (১) আত্ম-মর্যাদা, (২) সঠিক বিশ্বাস ও (৩) মৃত্য সংঘটিত হওয়ার অনুভূতি।[৮৭]

সুন্নাতের অনুস্বরণ করা এবং বিদ'আত পরিহার করাঃ

আল্লামা আওযা'ঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَا اِبْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا سُلِبَ وَرْعُهُ

আমরা আমাদের যুগে এ আলোচনা করতাম যে, যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তখন তার তাক্বওয়া-পরহেযগারিতাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।[৮৮]

আবু মুযাফফার আস-সাম'আনী রহিমাহুল্লাহ আহলে কালামীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وَهَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مُتَكَلِّمًا أَدَاهُ نَظْرَهُ وَكَلَامُهُ إِلَى تَقْوَى فِي الدِّيْنِ أَوْ وَرْعٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَوْ سِدَادُ فِي الطَّرِيْقَةِ أَوْ زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا أَوْ إِمْسَاكَ عَنْ حَرَامٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ خُشُوْعٍ فِي عِبَادَةٍ أَوْ اِزْدَيَادُ فِي طَاعَةٍ أَوْ تَوَرَّعُ مِنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا الشَّاذَ النَّادِرَ

'কোন কালামীকে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি, তার কালাম (কথা) ও চিন্তা-চেতনা তাকে দ্বীনের ব্যাপারে পরহেযগারিতার দিকে নিয়ে গেছে অথবা তারা পারস্পারিক আদান-প্রদান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করছে। অথবা চলার পথে তারা ভূল পথ ছেড়ে দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করছে এবং দুনিয়ার মায়া ছেড়ে দিয়ে পরকাল মুখি হয়েছে; বা কোন হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বিরত থাকছে। তারা তাদের ইবাদত বন্দেগীতে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন করার কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। আর তাদের কালাম বা কথা আল্লাহ তা'আলা প্রতি আনুগত্যটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে

[৮৫] *ইয়াহ্ইয়ার উলুমিদ্দীন ২/৮২পৃঃ*
[৮৬] *শু'আবুল ঈমান হা/২৭০[২৮৭]*
[৮৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/৬৮*
[৮৮] *আব্দুর রহমান 'আজলী, আহাদীছ ফী যাম্মিল কালাম ৫/১২৭পৃঃ*

অথবা তার কালাম তাকে কোন নাফরমানি বা অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখছে এরকম কোন নযীর তারা প্রমাণ করতে পারেনি।[৮৯]

***ইলম অনুযায়ী আমল করাঃ**

قَالَ سَهْلُ بْنِ عَبْدُاللهِ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ دَلَّهُ عَلَى الْوَرْعِ فَإِذَا تَوَرَّعَ صَارَ قَلْبُهُ مَعَ اللهِ

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখখন তার ইলম তাকে পরহেযগারিতার পথ দেখাবে। আর যখন সে পরহেযগারিতা অবলম্বন করবে তখন তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হবে।[৯০]

***দুনিয়া বিমুখ হওয়াঃ**

قَالَ أَبُوْ جَعْفَرَ الصَّفَّارَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَتْ اِمْرَأَةٌ : مِنَ الْبَصْرَةِ حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ يَدْخُلُهُ حُبُّ الدُّنْيَا أَنْ يَدْخُلَهُ الْوَرْعُ الْحَقِيُّ

আবু জা'ফর আস-ছাফফার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বছরার জনৈক নারী বলল, যার অন্তরে দুনিয়ার ভালবাসা প্রবেশ করেছে, তার অন্তরে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা প্রবেশ করা হারাম।[৯১]

قَالَ أَبُوْ جَعْفَرَ الْمِخْوَلِي رَحِمَهُ اللهُ حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ صَحِبَ الدُّنْيَا أَنْ يَسْكُنَهُ الْوَرْعُ الْحَقِيُّ

আবু জাফর আল-মিখওয়ালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে অন্তর দুনিয়াকে তার সাথী বানিয়েছে সে অন্তরে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা বসবাস করা হারাম।[৯২] অধিকাংশ মুত্তাকী বা পরহেযগার ব্যক্তিকে দেখা যায়, তারা অভাবী বা ফকীর-মিসকীন। এর কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা আর তারা বিপদগ্রস্ত মানুষ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাযত করুন-যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে না তারা সুদখোর, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে এবং হালাল-হারাম বেঁচে চলে না। এ ধরনের লোকদের মধ্যে কাউকে তাক্বওয়া অর্জন করতে দেখা যায় না। তারা সাধারণত দুনিয়াদারি নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ رَحِمَهُ اللهُ : مَا رَأَيْتُ وَرْعًا قَطُّ إِلَّا مُحْتَاجاً

সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি যত পরহেযগার লোককে দেখেছি, তাদের সবাইকে অভাবী দেখেছি।[৯৩] যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সে পরহেযগারিতা বার দ্বীনদারী অবলম্বন করতে পারবে না।

***রাগ থেকে দূরে থাকাঃ**

আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الْغَضَبُ عَلَى الْعَقْلِ اِرْتَحَلَ اَلْوَرْعُ

'যখন কোন অন্তরে রাগ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ রাগী মানুষ যখন রাগ করে তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে তাক্বওয়া অবশিষ্ঠ থাকে না।[৯৪]

কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখাঃ

ইমাম গাযযালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

مِفْتَاحُ الزُّهْدِ وَالْعَفَةِ وَالْوَرْعِ قِلَّةُ الْأَكْلِ وَقَمْعِ الشَهْوَةِ

দ্বীনদারী ও তাক্বওয়ার চাবিকাঠি হল, কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা।[৯৫]

***আশা-আকাংখাকে সীমিত করাঃ**

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قِلَّةُ الْحَرْصِ وَالطَّمْعِ تُوْرِثُ الصِّدْقَ وَالْوَرْعَ

'স্বল্প লোভ ও আশা-আকাংখা মানুষের মধ্যে সততা এবং দ্বীনদারী সৃষ্টি করে।

***কথা কম বলাঃ**

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَا قَالَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقْطُهُ وَمَنْ كَثُرَ سَقْطُهُ قَلَّ وَرْعَهُ وَمَنْ قَلَّ وَرْعَهُ أَمَاتَ اللهَ قَلْبَهُ

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী যাকারীয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যার কথা বেশী হবে, তার ভূল-ভ্রান্তি বেশী হবে, তার তাক্বওয়া কমে যাবে। আর যার তাক্বওয়া কমে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে নিস্প্রাণ বানিয়ে দিবেন।

ঝগড়া পরিহার করাঃ

আওযা'ঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাকাম ইবনু গায়লান আল-কাইসীর নিকট লিখিত চিঠিতে বলেন,

---

[৮৯] *আল-ইন্তিছার লি-আছহাবিল হাদীছ ১/৬৫পৃঃ*

[৯০] *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫)। উল্লেখ্য যে, হিলয়াতুল আউলিয়া (১০/২০৫) গ্রন্থে আমি 'আল-মুমিন' শব্দটি পাইনি সেখানে রয়েছে 'বিল-ইলম' যার অর্থ হবে, যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করবে- অনুবাদক*

[৯১] *ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ হা/২৯*

[৯২] *তারীখে বাগদাদ ১৪/৪১০, হা/৭৭৪৩*

[৯৩] *তাহযীবুল কামাল ২৮/৩৪০, হা/৬১১৬*

[৯৪] *হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/৩১৭পৃঃ*

[৯৫] *মা'আরিজুল কুদস ৮১পৃঃ*

دَعْ مِنَ الْجِدَالِ مَايُفْتِنُ الْقَلْبُ وَيَنْبِتُ الْضَغِيْنَةَ وَيَجْفِي الْقَلْبُ وَيَرِقُّ الْوَرَعَ فِي الْمَنْطِقِ وَالْفِعْلِ

'তুমি ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দাও, যা তোমার অন্তরকে কলুষিত করে, দূর্বলতা তৈরি করে, হৃদয়জগতকে শুকিয়ে দেয় এবং কথা ও কাজের মধ্যে তাক্বওয়া অবশিষ্ট রাখে না।[৯৬]

অন্যের চর্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নযর দেয়াঃ

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে কিভাবে তাক্বওয়া পূর্ণতা লাভ করবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

بِاِشْتِغَالِكَ عَنْ عُيُوْبِ الْخَلْقِ بِذَنْبِكَ وَعَلَيْكَ بِاللَّفْظِ الْجَمِيْلِ مِنْ قَلْبِ ذَلِيْلٍ لِرَبٍّ جَلِيْلٍ فَكِّرْ فِي ذَنْبِكَ وَتُبْ إِلٰى رَبِّكَ يَثْبُتُ اَلْوَرْعُ فِي قَلْبِكَ

'তুমি তোমার গুনাহের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তোমার প্রভূর নিকট তওবা কর, তাতে তোমার অন্তরে তাক্বওয়া বা দ্বীনদারী প্রতিষ্ঠিত হবে।[৯৭]

অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা হতে বিরত থাকাঃ

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

مَنْ شَغَلَ جَوَارِحِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَرَّمَ اَلْوَرْعُ

'যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরহেযগারিতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।[৯৮] তিনি আরো বলেন,

مَنِ اشْتَغَلَ بِالْفُضُوْلِ حُرِمَ الْوَرْعَ

'যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা হতে বঞ্চিত হয়।[৯৯]

লজ্জাশীল হওয়াঃ

قَالَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرْعَهُ وَمَنْ قَلَّ وَرْعَهُ مَاتَ قَلْبَهُ

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যার লজ্জা কম হয়, তার তাক্বওয়া কম হয়। আর যার তাক্বওয়া কম হয়, তার অন্তর মারা যায়।[১০০]

কোনটি গ্রহণযোগ্য দ্বীনদারী আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারী?

গ্রহণযোগ্য দ্বীনদারীঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

اَلْوَرَعُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الْوَرَعُ عَمَّا قَدْ تُخَافُ عَاقِبَتُهُ وَهُوَمَا يُعْلَمُ تَحْرِيمُهُ وَمَا يَشُكُّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِهِ

'গ্রহণযোগ বা শরী'আত সম্মত দ্বীনদারী হল, যেসব কাজের পরিণতি আশঙ্কাজনক তা থেকে বিরত থাকা। আর আশঙ্কাজনক কাজগুলো হল, যে কাজ হারাম হওয়ার বিষয়ে জানা গেছে অথবা যে কাজ হালাল কি হারাম সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এছাড়া যেসব কাজ করা থেকে ছেড়ে দেয়াতে তেমন কোন ক্ষতি নেই, সেগুলোও আশঙ্কাজনক কাজ।[১০১]

পূর্বে আমরা এ ধরনের তাক্বওয়া বা দ্বীনদারীর একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে সেগুলো আলোচনা করে দীর্ঘায়িত করতে চাইনা।

অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারীঃ

(ক) দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাঃ

কতিপয় লোক রয়েছে যারা দ্বীনদারী অবলম্বনে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এবং তারা ইসলামী শরী'আতের মূল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে আসে। এটি নিতান্তই বাড়াবাড়ি ও খারাপ কাজ। কেননা, সবকিছুর একটি সীমা রয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার সকল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে যায় এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়। সুতরাং, কোন মানুষের জন্য দ্বীনদারী অবলম্বনে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

যেসব মাসলা-মাসায়েল বিষয়ে মানুষ বাড়াবাড়ি করে তার মধ্য হতে একটি মাসআলা; যেমন- যখন হারাম মাল হালালের সাথে মিশে, তখন হুবহু হারাম মালকে হালাল থেকে আলাদা করতে হবে যদি কোন ব্যক্তি ১০০ দিনারের মালিক হয় তার অর্ধেক হালাল আর বাকী অর্ধেক হারাম। তখন সে যদি অর্ধেক থেকে পরিত্রান পেল; এ ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলে, নির্ধারিত হারাম অর্ধেক থেকে দায়মুক্তি দ্বারা সে কোন উপকৃত হতে পারবে না। এটিই হল, বাড়াবাড়ি যা তাক্বওয়ার সীমা থেকে এক ধাপ আগে বাড়িয়ে বাড়তি তাক্বওয়া অবলম্বন করা হয়, যার কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই।

---

[৯৬] *হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/১৪১পৃঃ*
[৯৭] *৯৮ হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/১৬পৃঃ) । কিঞ্চিত পরিবর্তিত*
[৯৮] *শু'আবুল ঈমান হা/৫০৫৬*
[৯৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/১৯৬*
[১০০] *ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব ২/৩৭০, হা/২২৫৯*
[১০১] *মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৫১১-৫১২, সংক্ষেপিত*

যখন হালাল মাল হারামের সাথে মিশে তার বিধান কি হবে? এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম তা থেকে গ্রহণ করাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু যদি হারামের পরিমাণ একেবারে সামান্য হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

يَنْبَغِيْ أَنْ يَّتَجَنَّبَهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا يَسِيْرًا أَوْ شَيْئًا لَا يَعْرِفُ

'এ ধরনের মাল থেকে বিরত থাকা উচিত, কিন্তু যদি তা সামান্য বস্তু হয়, বা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু না হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[১০২]

আবার কোন কো সালাফ বা আলেম বলেন, যদি যানা যায় যে, তার মালের মধ্যে হারাম মাল রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট করে জানে না, কোনটুকু হালালা আর কোনটুকু হারাম, তাহলে তার জন্য তা হতে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। ইমাম যহুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لَا بَأْسَ أَن يَؤْكُلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ

'এধরনের সম্পদ হতে খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে পারবে যে, নির্দিষ্ট এ সম্পদটি হারাম।[১০৩]

আবার কোন কোন আলেম কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই এ ধরনের সম্পদ থেকে দ্বীনদারী অবলম্বন করার কথা বলেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لَا يُعْجِبُنِيْ ذَلِكَ وَتَرْكُهُ أَعْجَبُ إِلَيَّ

'এ ধরনের সম্পদ ভক্ষণ করা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়, আর ছেড়ে দেয়া আমার মতে অধিক প্রিয়।[১০৪]

কিন্তু যখন যে পরিমাণ হারাম মাল তার মধ্যে প্রবেশ করছে, তা বের করে দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট মালকে ব্যবহার বা কাজে লাগানো হয়, তখন তা হতে ভক্ষণ করা যায়েজ। ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيْرًا أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَرَامِ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِيْ

'যদি অধিক সম্পদ থেকে কিছু হারাম সম্পদ বের করা হয় তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই।[১০৫] এ অবস্থার মধ্যে নির্ধারিত হারাম মালকে বের করে আনার পর তা থেকে বেঁচে থাকা বা সে মালকে কোন প্রকার কাজে লাগানো উচিত নয়। কেউ যদি একে তাক্বওয়া মনে করে তবে সে ভূল করবে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ হয়, কিন্তু এ ধরনের সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। যেমন তুমি কোন একজন মুসলিম ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলে যার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জান না। তারপর যখন তোমার সামনে সে খাবার উপস্থিত করল, তখন তুমি বলবে, তুমি যে টাকা দিয়ে বাজার করছ, সে টাকা কোথায় পেয়েছ?! এ ধরনের জিজ্ঞাসা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

এ ধরনের প্রশ্ন কি তাক্বওয়া হতে পারে? এ ধরনের প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই তাক্বওয়ার মানদণ্ডে পড়ে না। বরং এ ধরনের প্রশ্নের মধ্যে একজন মুসলিমকে কষ্ট দেয়া ও লজ্জা দেয়া হয়। কেননা, এ ধরনের প্রশ্ন করা হল, তাকে অপবাদ দেয়া হয়! কোন মুসলিমকে কোন প্রকার দলীল প্রমাণ বা আলামত ব্যতীত অপবাদ দেয়া এবং তাকে সেন্দেহের তালিকায় রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ। আর এ হল, একজন মুসলিমের প্রতি খারাপ ধারণা করা এবং একজন মুসলিমের জন্য আর অপর মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

(খ) কু-মন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসাঃ

এখানে কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এগুলোকে তাক্বওয়া বলা চলে না; বরং এগুলোকে কু-মন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা বলা হয়।

এর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ হল, আল্লামা ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাৎহুল বারীতে উল্লেখ করেন,

وَرَعِ الْمُوَسْوَسِينَ كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ كَانَ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ أَفْلَتَ مِنْهُ ، وَكَمَنْ يَتْرُكُ شِرَاءَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَجْهُولٍ لَا يَدْرِي أَمَالُهُ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ وَلَيْسَتْ هُنَاكَ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى الثَّانِي ،

'কোন কোন লোক এমন রয়েছে তারা শিকার করা পাখি খায় না, তারা আশঙ্কা করে, শিকারটি কোন মানুষের ছিল, তারপর সে তার মালিকের নিকট থেকে

[১০২] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৭০পৃঃ*
[১০৩] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৭০পৃঃ*
[১০৪] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৭০পৃঃ*
[১০৫] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/৭০পৃঃ*

পালিয়ে গেছে, তাই সে চিন্তা করে মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা হতে খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় বস্তু কোন অপরিচিত লোক থেকে ক্রয় করে তা খায় না। তার যুক্তি হল, তা কি হালাল না হারাম তা সে জানে না। অথচ এখানে এমন কোন প্রমাণ নেই বা একথা প্রমাণ করে যে, বস্তুটি হারাম। কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ শরী'আতের মূলনীতি হল, প্রতিটি বস্তুর আসল প্রকৃতি হল, হালাল হওয়া। যদি হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। আর যদি হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে হারাম বলা যাবে। অন্যথায় তাকে হারাম বলা হামার।[১০৬]

***ওয়াসওয়াসার আরেকটি দৃষ্টান্তঃ**

আল্লামা যারকশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ غَزْلَ زَوْجَتِهِ فَبَاعَتْ غَزْلَهَا وَوَهَبَتْ الثَّمَنَ لَمْ يَكْرَهْ أَكْلُهُ فَإِنَّ تَرْكَهُ فَلَيْسَ بِوَرْعٍ بَلْ وَسْوَاسَ

'যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে, সে তার স্ত্রীর কাপড় পরিধান করবে না। এরপর স্ত্রী তার কাপড়টি বিক্রি করে দিল এবং বিক্রয় মূল্যটি তার স্বামীকে দান করল, তখন তার জন্য তা খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, তার ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়া কোন দ্বীনদারী নয়, বরং তা হল, ওয়াসওয়াসা।[১০৭]

বিশেষ পরহেযগারিতা

কিছু কিছু বিষয়ে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী রয়েছে যেগুলো শুধু বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সবার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ এ ধরনের পরহেযগারিতাকে খাছ পরহেযগারিতা বলা হয়। আল্লামা ইবনু রজব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وَهَاهُنَا أَمْرٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ وَهُوَ أَنَّ التَّدْقِيْقَ فِي التَّوَقُّفِ عَنِ الشُّبَهَاتِ إِنَّمَا يُصْلِحُ لِمَنْ اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُ كُلُّهَا وَتَشَابَهَتْ أَعْمَالُهُ فِي التَّقْوَى وَالْوَرْعِ فَأَمَّا مَنْ يَقَعُ فِي اِنْتِهَاكِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يَتَوَرَّعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَقَائِقِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَنْكِرُ عَلَيْهِ

'এখানে একটি বিষয় রয়েছে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত যরূরী। আর তা হল, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বিরত থাকা তা জন্য মানায়, যার সকল অবস্থা স্থীর এবং তার আমলসমূহ তাক্বওয়া বা দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে হারামে লিপ্ত হয়, তারপর সে সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে দ্বীনদারী অবলম্বন করে; তার জন্য এধরনের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা মানায় না। তার ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বীনদারী বা পরহেযগারিতা কোন ক্রমেই প্রযোজ্য নয় বরং তাকে এ ধরনের পরহেযগারিতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।[১০৮]

যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইরাকের এক অধিবাসী ব্যঙের পেশাবের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে তিনি বলেন, তারা আমাকে বেঙেগর পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا 'দুনিয়াতে তারা উভয়ে আমার দুই বাহু।[১০৯]

وَسُئِلَ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِيْ بَقْلًا وَيَشْتَرِطُ الْخَوْصَةُ يَعْنِي الَّتِي تُرْبَطُ بِهَا حَزَمَةَ الْبَقْلِ فَقَالَ أَحْمَدُ إِيْشَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ؟! قِيْلَ لَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ نُعَيْمٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ كَانَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ نُعَيْمٍ فَنَعَمْ هَذَا يَشْبَهُ ذَاكَ

ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, একজন লোক সবজি কেনার সময় শর্ত দিয়ে বলল, আমি তোমার থেকে সবজি এ শর্তে ক্রয় করতে পারি, তুমি আমাকে একটি দড়ি দিবে যার দ্বারা আমি আমার সবজিগুলো বেধে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কথা শুনে বলল, এ ধরনের কাজ কে করে? তখন তাকে জানানো হল, ইবরাহীম ইবনে আবু নু'আইম এ ধরনের কাজ করে থাকে। তখন তিনি বললেন, যদি ইবরাহীম ইবনে আবু নু'আইম এ ধরনের কাজ করে থাকে তবে তা বৈধ। কেননা, দড়িটি সবজির সাথে সম্পৃক্ত।[১১০]

সার কথাঃ কিছু কিছু বিষয় রয়েছে এত সূক্ষ্ম যা থেকে বেঁচে থাকা কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং যারা এসব থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তারা যদি ফাসেক বা

[১০৬] *ফাৎহুল বারী ৪/২৯৫পৃঃ*
[১০৭] *আল-মানছুর ফিল ক্বাওয়ায়েদ ২/২৩০*
[১০৮] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১১১পৃঃ*
[১০৯] *বুখারী হা/৫৯৯৪; জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১১১পৃঃ*
[১১০] *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১১১পৃঃ*

সুযোগ সন্ধানী লোক হয়, তাদেরকে তা হতে বিরত রাখতে হবে এবং তাদের প্রতিহত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

একজন মানুষের জন্য দ্বীনদারী বা পরহেযগারিতা ছেড়ে দেয়ার মধ্যে দার দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক ক্ষতি নিহিত। সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

أَيُّمَا عَبْدٌ لَمْ يَتَوَرَّعْ وَلَمْ يَسْتَعْمِلِ الْوَرَعَ فِي عَمَلِهِ اِنْتَشَرَتْ جَوَارِحُهُ فِي الْمَعَاصِي وَصَارَ قَلْبُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ وَمُلْكِهِ

‘যখন কোন বান্দা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে না এবং আমল করার ক্ষেত্রে সে পরহেযগারিতাকে কাজে লাগায় না, তখন তার অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ধীরে ধীরে তার অন্তর শয়তানের হাতে বা কব্জায় চলে যায়। তখন তার থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১১১]

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ তাক্বওয়া বা দ্বীনদারী অবলম্বন না করার কারণে তার আমলসমূহ বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ তার আমল কোন কাজে আসে না। ইয়াস ইবনু মু‘আবিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে পরহেযগারিতা দ্বীনদারী বা তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা অবশ্যই অনর্থক।[১১২]

বরং পরহেযগারিতা বা তাক্বওয়া ছেড়ে দেয়া উম্মতে মুসলিমাকে ধ্বংস করে দেয়। আর পরহেযগারিতা বা তাক্বওয়া ছেড়ে দেয়া মুসলিম উম্মাহর ভাল কাজগুলোকে স্বমূলে উৎখাত করার কারণ হয়। সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

تَظْهَرُ فِي النَّاسِ أَشْيَاءَ يَنْزَعُ مِنْهُمُ الْخُشُوْعَ بِتَرْكِهِمُ الْوَرَعَ

‘পরহেযগারিতা ছেড়ে দেয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যা মানুষের বিনয়কে মানুষ থেকে তুলে নিবে।[১১৩]

পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী জোর করে সাব্যস্ত করার বিষয় নয়, যে একজন ব্যক্তি জোর করে বা দাবি করে পরহেযগার হতে পারবে। বরং তা অর্জন করার জন্য আমল করতে হবে এবং সাধনা বা গবেষণা করতে হবে।

[১১১] *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫*
[১১২] *তাহযীবুল কামাল ৩/৪১৩*
[১১৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৬*

যারা হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে না এবং হালাল হারাম বেঁচে চলে না, তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা দাবি করা মিথ্যা বৈই আর কিছুই নয়। হতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

مَنْ اَدْعَى حُبَّ اللهِ بِغَيْرِ وَرْعٍ عَنْ مُحَارِمِهِ فَهُوَ كَذَّابٌ

‘যে ব্যক্তি হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে না, সে অবশ্যই মিথ্যুক।[১১৫]

একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হল, তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য যেন হয়, দ্বীনের বিষয়ে তাব্ওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহ তা‘আলার ভয়কে কাজে লাগানো এবং আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে সব সময় আল্লাহ তা‘আলাকে তার নিকটে বলে জানা।

وَوَاظِبْ عَلَى التَّقْوَى وَكُنْ مُتَوَرِّعاً + صَبُوراً عَلَى البَلْوَى وَبِالدِّينِ كُنْ شَهْمَا

‘তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তুমি পরহেযগার হও। বিপদে তুমি ধের্যশীল থাক এবং দ্বীনের বিষয়ে তুমি বিচক্ষণ হও।[১১৬] সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যার অন্তরের মধ্যে দ্বীনদারী বা পরহেযগারিতা পরিলক্ষিত হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুত্তাক্বী বানিয়ে দাও অথবা আমাদেরকে সকল কাজে হেদায়াত দান কর। আর তাক্বওয়া বৃদ্ধি করে দাও এবং জান্নাতকে আমাদের গন্তব্যস্থল বানাও। আর আমাদেরকে তুমি এমন শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান কর, যা তোমাকে খুশি করে। আর তুমি আমাদেরকে এমন পরহেযগারিতা দান কর, যা আমাদেরকে তোমার নাফরমানির মাঝে দেয়াল হিসেবে বিবেচিত হয়। আর তুমি আমাদেরকে এমন চরিত্র দান কর, যা দ্বারা আমরা মানুষের সাথে ভালভাবে বাঁচতে পারি। আর আমাদেরকে তুমি এমন জ্ঞান দান কর যদ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের পথ প্রদর্শক বানাও। আপনি আমাদের পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবে না। আর আপনি আমাদের সকলের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর সকল প্রশংসা তার জন্য যার অপার অনুগ্রহে যাবতীয় সৎ আমলসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

অনুকরণীয় আদর্শ; মানুষ মুহাম্মদ ﷺ

মো. আবদুল হাই ❄

রাসূল ﷺ-এর শিশুকাল:

ভূমিকা: প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, এটি রসূল ﷺ-এর ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। কেননা; সময়, সত্যতা যাচাইবাছাই, নিখুঁত তথ্যভান্ডার, সঠিক পর্যালোচনা, ধারাবাহিকতা, সবকিছু ঠিক রেখে তার জীবনীগ্রন্থ লেখার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমরা খুব সাধারণ মানুষ। আর অতি সাধারণ্যের যিনি নবী তিনিও খুব সাধারণ, অন্তত যাপিত জীবনে। সেই অতি সাধারণ, কিন্তু মহাপ্রলয় পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র অনুসরণীয়, অনুকরণীয় আদর্শ মানুষ; তাকেই খুব সাধারণভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি মাত্র।

সেজন্য খুব সাদামাটাভাবে রসূল ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে তার শিশুকাল থেকে শুরু করে তরুণ, যুবক ও শেষ বয়সেরও আলোচনা আনা হয়েছে। আর এটা করার উদ্দেশ্য হলো আমাদের জীবনে সব স্তরে তিনিই যে একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ তা খুব সহজভাবে উপস্থাপন করা। যাতে করে সে আলোকে আমরা আমাদের জীবনকে সাজাতে পারি। তারই অংশ হিসাবে আমরা এখানে তার শিশুকালের আলোকে আমাদের নিজেদের পরিবার, সন্তানদের সাজানোর চেষ্টা করবো।

কৈফিয়ত : অনেক দিন পর লেখালেখিতে আসা। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি! তবে এটুকু অন্তত বলতে পারি, অফুরন্ত ভালোবাসা আর আবেগাপ্লুত হৃদয়ের অনুভূতিগুলো বের হয়েছে কালির আঁচড়ে। আর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো রসূল ﷺ-এর চলমান জীবনের মণি-মুক্তোগুলোর আলোকে এর এক একটি অধ্যায়কে সাজাতে। তাই, এ নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারি, পাঠক বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই। বরং মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়াতে হবে। ভাবনার কথাগুলো ভাবাবে। খুব সাধারণ কিন্তু মর্তবায় অসাধারণ যা ভুলে, হেলাফেলায় হারিয়েছি এতোকাল। আফসোস হবে, আবার আত্মপরিচয়ে উৎফুল্ল হবে মন-মানস। আর বারবার নিজ পরিচয়ে, নিজ ঘরে ফেরার আঁকুতি আপনাকে করবে নমনীয়। যেখান থেকে আসবে নিজকে নতুন করে তৈরির ভাবনার বিষয়টি। আর হয়তো মহান রবের কৃপায় পরিবার, সন্তান আর নিজেকে গোছানোর চেষ্টায় থাকবে আবারো। যেটা প্রয়োজন আমার আপনার সবার।

আমার আর একটি সহজ স্বীকারোক্তি এই যে, এখানে আমি রেফারেন্স খুব কম ব্যবহার করেছি। কারণ হিসাবে বলতে পারি ১) এখানে শরীয়তের খুব কঠিন ও জটিল বিষয়গুলো আলোচনা করিনি। এমন সব বিষয় আলোচনা করেছি যেগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই মোটামুটি জানা। বলা যেতে পারে এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুব পরিচিত আলাপন। এ জন্যই বোধকরি, এগুলো প্রায়ই অবহেলিত ও অনাদৃত। যদিও রাসূল ﷺ-এর ভক্ত ও অনুরক্তের অভাব নেই। কিন্তু শুধুমাত্র অনুশীলনের অভাবেই পরিবার সমাজে নানামুখী অসংগতি। কারণ, জানা থাকলেও জীবনের পরতে পরতে ছিলো না শ্রেষ্ঠ রসূলের জীবনকে প্রাকটিসে পরিণত করার প্রচেষ্টা। সেই ব্যাথা থেকেই সুতীব্র আকুলতায় আপনাদের সমীপে। আপনাদের ভালো লাগার অনুভূতিতে যুক্ত থাক অফুরন্ত দোয়া আর ক্ষমার সুদৃষ্টি।

সেই সাথে আমরা চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন স্তরে রসূলের ﷺ এর নামে তথাকথিত নাস্তিক, একচোখা মানুষদের আনিত অভিযোগগুলোর মার্জিত ভাষায়, যৌক্তিক যুক্তিতে খন্ডনের। একমাত্র হটকারী, স্বার্থান্ধ আর বদ্ধ হৃদয়ের জন্য এ আহবান ব্যর্থ। তবুও মহান রবের কাছে তাদের সুমতির জন্য প্রার্থনা। তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে হেদায়েত দান করেন। আর আমাদের যুক্তিকে আরো প্রাঞ্জল ও শাণিত করার তাওফিক দেন- আমিন। তবে চলুন আমরা মূল আলোচনার দিকে এগোই।

শিশু মুহাম্মদ ﷺ

প্রাসঙ্গিকতা : আমরা মানুষ। আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত। আমাদের রসূল মুহাম্মদ ﷺ। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী; মর্যাদায় আমাদের কাছে অতি নগণ্য। এমন বক্তব্য তুলে তৃপ্তির ঢেকুর তুললাম। যাক আর কী চাই!

❄ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও নির্বাহী পরিচালক শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

কিন্তু এরপরেও মানুষ হিসাবে আমাদের এইম দৈন্যতা কেন? আর মনুষ্য শ্রেণির মধ্যে তো বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর নাম মুসলমান। কিন্তু কেন এমন অবস্থা, নেপথ্যের সেই কারণগুলোর প্রতি আমরা কখনো মনোযোগী নই। পশুকে নির্যাতন করে মারা হয় না। ক্ষুধার কারণেও অধিক সংখ্যক পশু কখনো মারা গেছে বলা কঠিন। কিন্তু দেশে দেশে দারিদ্রপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর ক্ষুধার সমস্যা তৈরি হয়েছে। না খেয়ে মারা গেছে অনেকে। যদিও তার অধিকাংশই কৃত্রিম সঙ্কটে, অথবা উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার। কিন্তু স্রষ্টা আরশের উপরে থেকে এসব নির্যাতনের হাত থেকে সরাসরি আমাদেরকে রক্ষা করছেন না! কই, আমার সামনেই তো অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অট্টালিকার পাহাড় গড়ছে। অর্থ, প্রাচুর্য, বিত্ত-বৈভবের কারণে আমি তো তাদের পাশেই দাঁড়াতে পারছি না। তাই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে গিয়ে দেখি চুনা লাগে। হীনমন্যতায় আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হয় নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে। তাহলে, এতোক্ষণ যা চিন্তা করলাম তা কি ভুল ছিলো?

না! তাতো ভুল হবার কথা না। কারণ, আমি মানি বা না মানি, জানি তো যাকে অনুসরণ করছি, তিনিই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে একমাত্র তার অনুসরণেই শান্তি আসতে পারে; এ তো আমার বিশ্বাসেরই একটা অংশ। কারণ, তার ব্যাপারে যে মহান স্রষ্টা অবিসংবাদিত সংবিধানে বলে দিলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত'।[১১৪]

কিন্তু, আমার দাবি যে সত্য, সেটি তো আমাকে প্রমাণ দিতে হবে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমি যা বলেছি তা সত্য। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিনি, মিথ্যা দাবিও করিনি।

হ্যা, এবার হয়তো আপনি বলবেন, আমি ঠিকই বলেছি। তিনি একজন রসূল। তবে একজন রসূলের সাথে আমাদের সাধারণ মানুষের মিল কীভাবে হতে পারে? কেমন করেই বা তার জীবনালোকে আমাদের জীবন সাজাতে পারি? এও কি সম্ভব? হ্যা সম্ভব! অবশ্যই শতভাগ তার মতো নয়। কিন্তু তার আদর্শের আলোকে অন্তত পুন্যবান মানুষের সারিতে শামিল হতে পারি।

আর এ কারণেই এখানে আমি তার সেই জীবনের সেই অংশই সহজভাবে আলোচনা করতে চাই, যে জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন দীর্ঘ চল্লিশ বছর। যখন পর্যন্ত তার কাছে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে কোনো প্রত্যাদেশ আসেনি। যখনও তিনি প্রচার করেননি আমি একজন রসূল। এখন হয়তো আমাদের মানতে কোন আপত্তি নেই যে, এ পর্যন্ত তিনি আমাদের মতো সাধারণ একজন মানুষ। তবে, তার জীবনের কিছু অংশ কি আমি মানবো নাকি তার পুরো জীবনটাই আমার জন্য অনুসরণীয়। হ্যা, আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে, তিনি রসূল হবার পূর্ব পর্যন্ত যতদিন মানুষ ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন তার বাকি জীবনটাও আমার জন্য অনুসরণীয় হবে। দেখুন মহান আল্লাহর নির্দেশনা,

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

''তোমাদের জন্য রসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আর্দশ''।[১১৫]

আর এখানে রাসূল ﷺ-এর শিশুকাল থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটি বাঁকে সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে শিশুদের জন্য তিনি মডেল। তরুণদের জন্য তিনি অগ্রণী। যুবকদের জন্য অনুপ্রেরণার মহান উৎস। আর অন্য সবার জন্য তিনিই একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তবে আসুন আর একটু সামনে এগোই।

ছোট্ট তিনি : ছোট্ট শিশু। বেড়ে উঠতে চায় আদরে। দাবি যেন একটাই। বাবা, মা, ভাই, বোন, দাদা-দাদি, ফুফুদের কোলে। আদর চায় সে, ঠিক যেমনটি দোলনায় দোলানো শিশুটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে আমরা হাসি। নানা রকম গল্পে তাকে মাতিয়ে রাখি সারাক্ষণ। সে কি কথাগুলো বুঝতে পারে? বড় অদ্ভুত না! তবুও থামে না আমাদের কথার ফুলঝুরি। যদিও ভাষাগুলো তার কাছে বড়ই বিচিত্র, আবেগের অনুভূতিগুলো তো আর ভিন্ন নয়। পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের শিশুদের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য সমান।

শিশু মুহাম্মদ ﷺ কি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম? তিনি ﷺ ভূমিষ্ট হলেন। সিক্ত হলেন গর্ভধারিণী মায়ের বুকের উষ্ণতায়। বুকে জড়ানো, চুমুতে ভরানো, মিষ্টি করে

[১১৪] *সূরা কলাম আয়াত: ৪*

[১১৫] *সূরা আহযাব আয়াত: ২১*

হাসি, মন ভুলানো কথা, অনিন্দ্য সুন্দর অভিব্যক্তি সবটাই দিলেন। আর দাদা হৃদয়ের সবটুকু আবেগ মিশিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নাম পছন্দ করলেন প্রিয় নাতির জন্য; **'মুহাম্মদ- বা প্রশংসিত।** আরবে এর পূর্বে এ নাম রাখেনি কেউ। শুরুতেই যেন ভিন্নতার ছোঁয়া!

এটা কি তিনি অদ্ভুত কোন খেয়ালে করেছিলেন নাকি অদৃশ্য জগৎ থেকেই মহান আল্লাহর কোনো ইঙ্গিতে করেছিলেন তা আমরা জানি না। কিন্তু শুধু জানি, এই অনিন্দ্যসুন্দর নামটিই আজ লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দন। পৃথিবীর আনাচে কানাচে স্মরণ হচ্ছে, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে।

শিশুর প্রতি সদয় হোন: আমার, আপনার শিশুরাও আদর চায়, সোহাগ চায়। চায় একটুখানি ভালোবাসা মেশানো হাসি। কী অদ্ভূত তাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব। তাদের আবেগি চাওয়াকে যথাসাধ্য পূরণ করুন। ভাবুন যে, আপনার নয়; আপনার শিশুর যত্নই এখন আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকাঙ্খিত। মহানবী ﷺ তার পরিবারের কাছ থেকে এর সবগুলোই পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মায়ের নয়নের পুত্তলি। দাদুর কাছে অনিঃশেষ ভালোবাসার জিনিস। চাচার কাছে ছিলেন বরকতের খাজানা। দুধ-মাতার পরিবারের জন্য ছিলেন স্রষ্টার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত। আর প্রতিবেশি, খেলার সাথি বা অন্যান্যদের কাছে বড়ই প্রিয় বন্ধু।

আপনি কি আপনার সন্তানের প্রতি এমন? নাকি ভিন্ন আচরণের? একটি জিনিস দু'বার চাইলে ধমক দিয়ে কথা বলেন? হাত থেকে ছোট খাটো বস্তু পড়ে ভেঙে গেলে রেগে গিয়ে মার দেন। আপনার ব্যস্ততার জন্য সন্তানের সাথে হাসিমুখে খেলার সময় কই! সকাল থেকেই অফিসের জন্য তাড়াহুড়া। স্বামীর কর্মের তাড়া মিটিয়ে, নিজের সকালের খাবার, দুপুরের খাবার প্রস্তুত করে, বুয়া বা অন্যান্য অভিভাবকের কাছে সন্তানকে রেখে আপনাকে যেতে হয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার জন্য দিনে দুই একবার, কোনদিন হয়তো তাও নয়, এভাবেই সন্তানের খোঁজ নেন। আবার বাসায় এসে ক্লান্তি শ্রান্তি দূর হলে মোবাইলে ফেসবুকিং, চ্যাটিং নিয়ে ব্যস্ত। অথবা অফিসের কিছু বাড়তি কাজ শেষ করা নিয়ে সময় পার। নিজের এতসব ব্যস্ততার পরেও আপনি সমাজের সবচেয়ে সুন্দর সন্তানটিই চান?! বিপরীত মেরুতে বাস করে সুফল পাওয়া কি সম্ভব?

না! শিশুর জন্য এমন আচরণ সুখকর নয়। মনে রাখবেন শিশুদের ছোট্ট মন খুবই সংবেদনশীল। ছোট-খাটো বিষয়গুলো তারা মনে রাখতে পারে অসাধারণভাবে এবং এগুলো তাদের মনে দাগও কাটে। তাই, শিশুর জন্য অবশ্যই আপনাকে আলাদা সময় বের করতে হবে। তার আচরণগুলোকে বুঝার চেষ্টা করুন। ছোট-খাটো ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করতে শিখুন। তবে, তা যেন প্রশ্রয়ের সীমানায় না পড়ে। তাহলে হিতে বিপরীত ফল হবে।

শিশুর দক্ষতাকে মূল্যায়ন করুন: আপনি ধরেই নিয়েছেন যে, আপনার সন্তান ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। না হলেও সরকারী, বেসরকারী বড় কোন অফিসের কর্মকর্তা হবে। তাই সব প্রচেষ্টা থাকে, তাকে যেকোনো মূল্যেই এগুলো অর্জন করতেই হবে। এজন্য নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে তার পেছনেই কাটতে থাকে ব্যস্ত সময়। কিন্তু আপনার সন্তানের এদিকে আগ্রহ অনেক কম। এছাড়া আপনি জানেনই না, আপনার সন্তান আজ পর্যন্ত ভালো কিছু করে আপনার কাছে প্রশংসা পেয়েছে! কারণ, অন্যের অহেতুক প্রশংসা করা আপনার স্বভাবে নেই। নিজ সন্তানের ক্ষেত্রেও এ ভাবনার ব্যত্যয় ঘটেনি। সন্তান কিছু করলেও তার চেয়েও পাশের বাড়ির অন্য ছেলেটিই যে ভালো করেছে, তাই তাকে আরো ভালো করার তাড়া। অজান্তেই আপনার সন্তানের আনন্দের মুহূর্তটিকে অন্যের প্রশংসা দিয়ে দাবিয়ে দিলেন। এটি যে সন্তানের আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটা আপনি জানেন না। এর ফলে তার মধ্যে তৈরি হবে হীনমন্যতা। বাড়িয়ে দেবে হতাশা।

আবার শিশু খেলাধুলার ছলে নতুন কিছু আবিষ্কার করলে ঝাড়ি দিয়ে তাকে থামালেন, পড়াশুনা বাদ দিয়ে আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট বলে উপহাসের তোড়া তার জন্য। ফলে, সে ঐ বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে বসে আছে। মনে রাখুন, শিশুসহ পরিবারের অন্যরা ভুল করলে ক্ষমা করতে শিখুন। ভালো বাসতে শিখুন। যাতে করে তারা সংশোধন হতে পারে। তবে তা অবশ্যই সতর্ক থেকে। দেখনু মহান আল্লাহর নির্দেশনা,

﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

''হে মুমিনগণ! তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। তবে যদি মার্জনা করো,

উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তবে আল্লাহও ক্ষমাশীল, করুণাময়।[১১৬]

মরুচারী শিশু মুহাম্মদ ﷺ এমন সব বাধা থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি স্ব-ইচ্ছায় অনেক কিছুই শিখলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবোধ, খেলাধুলায় পারদর্শিতা, বৈধ বিনোদনের বিভিন্ন শাখায় তার সমান দক্ষতা ছিলো। আর কতটা ইনসাফপূর্ণ ছিলেন তিনি, দুধ-মা'র কোলেই তার প্রমাণ দিলেন। নিজের জন্য বরাদ্দ দুধ-মা'র একটি স্তন্যই তিনি পান করতেন সবসময়। অন্য স্তন্য দিয়েও তাকে কখনো পান করানো সম্ভব হয়নি। কোনভাবেই তিনি নিজের দুধ ভাইয়ের হককে নষ্ট করেননি। খেলাধুলা করতে গিয়ে কখনো কারো সাথে মারামারি করেননি।

তবে এক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন, তা কিন্তু তার কাছে চাপ হয় এমন বিষয় ছিলো না। বরং সেখানে ছিলো দায়িত্বপূর্ণ আচরণ, নতুন কিছু জানার উত্তেজনা তার কাছে ছিলো আনন্দপূর্ণ। যদিও সেগুলো ছিলো খুবই সামান্য ও ছোটখাটো বিষয়। কিন্তু মরুভূমির উত্তপ্ত পরিবেশে নিত্য নতুন অবস্থার সাথে বাঁচার এক অকৃত্রিম আনন্দ। কারণ, যাযাবর শ্রেণির মানুষ কখনো এক জায়গায় স্থির নয়। তাদের প্রধান কাজ ছিলো পশুচারণ, সেগুলোর খেয়াল রাখা, ছোট-খাটো ফরমায়েশ, যেমন পশুর পালের দিকে নযর রাখা, পানি আনা, খাওয়ানো, তাঁবু মেরামত, অন্যদের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। শিশু মুহাম্মদ ﷺ অবশ্যই সেগুলো করেছেন এবং আনন্দের সাথেই। শিশু বয়সের এসব ছোটো খাটো কাজগুলোই পরবর্তীতে তাকে যোগ্য দায়িত্বশীল হতে সহায়ক হয়েছে। সংক্ষেপে এই ছিলো শিশু মুহাম্মদ ﷺ'র শিশুসুলভ আচরণ।

এখন আমাদের সন্তানের ক্ষেত্রে বলি! যতটুকই সে শিখেছে, করতে চায়, তাকে মূল্যায়ন করুন। খাতায় হিজিবিজি আঁকলেও তার প্রশংসা করে সুন্দর করে আবার লিখে দিন। কোনো জিনিস ভেঙে গেলে ধমক না দিয়ে জিনিসটাকেই সরিয়ে রাখুন। স্বাধীনভাবে তাকে কিছু সময়ের জন্য খেলতে দিন। লক্ষ্য করুন! সে কোন বিষয়ের প্রতি বেশি মনোযোগী। ভালো হলে সেই বিষয়েই তাকে কাজ করার সুযোগ দিন। নিয়মিত উৎসাহ দিন। তবে মন্দ বিষয় হলে, কৌশলে তাকে সেখান থেকে দূরে রাখুন। বুঝানো সম্ভব হলে বুঝিয়ে বলুন। শিশুদের সাথে 'না' নয়, এই কথাটি স্মরণ রেখে আপনার কাজটি করুন। আর মনে রাখুন, অতিরিক্ত চাপ, সমালোচনা, তিরস্কার, অমনোযোগ, অসহযোগিতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। তার আচরণে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই, নিজের বদ-অভ্যাসগুলোও কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুন। শিশুর সামনে কখনোই ধুমপান নয়। কারণে, অকারণে চিৎকার, চেঁচামেচি ধমক দিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, অবচেতনভাবেই শিশু আপনাকে অনুসরণ করছে বিষয়টি মনে রাখবেন। তাই, তার পছন্দের কাজটিকেই সঠিকভাবে করার পরিবেশ তৈরি করে দিন।

আর অবশ্যই ছোট্ট বয়স থেকেই তাকে কালোত্তীর্ণ সে উপদেশে গড়ে তুলুন। যে উপদেশ দিয়েছেন লুকমান ﷺ তার সন্তানদের।

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ

''হে বৎস! নামায কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।[১১৭]

ভাষা শিক্ষা: শিশুর আত্মিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের অন্যতম একটা মাধ্যম হলো ভাষা শিক্ষা। এখানে ভাষার ওপর দক্ষতাও সমভাবে কাজ করে। আর আরবের অন্যতম একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শুদ্ধ ভাষার চর্চা। এদিক থেকে আরবের মরু অঞ্চল হিজাজ অন্য যেকোন জায়গার চেয়ে ছিলো একধাপ এগিয়ে।

রসূল ﷺ কে জন্মের পরেই হিজাজে পাঠানো হয়েছিলো। এটি ছিলো সে সময়কার মরু অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল। পাশাপাশি এ অঞ্চল তৎকালীন আরবের প্রচলিত অনাচার ও অত্যাচার থেকেও অনেকাংশে মুক্ত ছিলো। সচেতন মক্কাবাসীরা তাই সন্তানের ভাষা দক্ষতা, সৎ আচরণ, চারিত্রিক সততার মতো গুণগুলো সমৃদ্ধির জন্য সন্তানদের সেখানে পাঠাতেন। তবে, মূল উদ্দেশ্য ছিলো শিশুদেরকে প্রকৃত আরবীয় হিসাবে গড়ে তোলা।

লক্ষ্য করুন! রসূল ﷺ প্রায় ৪ বছর সেখানে কাটিয়েছেন। একটা শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের উপযুক্ত সময় এটি। এ সময়টাতেই তারা ভাষার

[১১৬] *সূরা তাগাবুন আয়াত: ১৮*

[১১৭] *সূরা লোকমান আয়াত: ১৭*

উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। শিশু মুহাম্মদ ﷺও তাই করেছিলেন। তিনি যে পরিবারের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, সেখানে কমবেশি ৫ জন সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে ৩ জন ছিলেন প্রায় তার সমবয়সের। তিনি তাদের সাথে থেকে ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করেন। মরুচারী বেদুইনরা তাদের নিজস্ব আরবী ভাষায় কথা বলতো। আরবের এ অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তবে সেখানে মূলত, দুই ধরনের ভাষাভাষী লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

১) স্থায়ী বাসিন্দা: এরা মরুভূমির স্থায়ী বাসিন্দা। যাযাবর হিসাবে পরিচিত ছিলো। নিজস্ব ভাষায় কথা বলতো। উপার্জন হিসাবে মেষ চরাতো। আর মক্কার অভিজাত শ্রেণির সন্তানদেরকে অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে লালন-পালন করতো। তারা ছিলো কিছুটা স্বাধীনচেতা। এদেরই গোত্রের একজন বিদুষী মহিলা হালিমা সাদিয়ার কাছে শিশু মুহাম্মদ ﷺ প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি সেখানেই শিখেছেন বিশুদ্ধ আরবী ভাষা, রপ্ত করেছেন অসাধারণ বাচনভঙ্গি, হৃদয়ে দ্যোতনা সৃষ্টিকারী শব্দচয়ন। এসব গুণই তাকে পরবর্তী সময়ে পরিণত করেছে একজন দক্ষ বক্তায়, কুশলী আলোচকে। ফলে তার সাথে কেউ কথা বললে তাদের পূর্বের খারাপ ধারণা পাল্টে যেত। তার কথার মধ্যেই যেনো তাদের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত চাওয়াগুলো পূরণ হতো। কারণ, তারা স্বভাবগতভাবেই সাহিত্যের সমঝদার ছিলো। তাই রসূল ﷺ এর ভাষার গভীরতা বুঝতে তাদের কোন কষ্টই হতো না।

২) অস্থায়ী বা আগন্তুক : এই অংশের লোকেরা মূলত বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে এখানে আসতো। তারা এই অঞ্চলের লোকের সাথে কিছুদিন ক্রয়-বিক্রয় করে আবার চলে যেতো। এর মধ্যে অভিজাত আরবের বিভিন্ন গোত্রও থাকতো। এছাড়াও হাজ্জের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন আসতো। যার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাভাষী লোকের উপস্থিতিও ছিলো। এদের কাছ থেকেও রসূল ﷺ আরবী আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে ধারণা পান। কিন্তু তাদের সাময়িক অবস্থানের কারণে সে ভাষা রপ্ত করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তিনি এগুলো সম্পর্কে জানতেন। যা তার পরবর্তী জীবনে বাড়তি দক্ষতা হিসাবে কাজ করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের মধ্যে সবার আগে ভাষার উপর দক্ষতা তৈরি হয়। জন্মের ১ম বছরে তারা বিভিন্ন বিষয়ে কমবেশি কিছু শব্দ জানে। দুই বছর থেকে ৪ বছরের মধ্যে এর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। ৪/৫ বছরের মধ্যে আমাদের ব্যবহারিক হাজারের অধিক শব্দের উপর দক্ষতা তৈরি হয়। এ সময়ে সে এগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

আপনার জন্য: এ অবস্থায় আপনার সন্তানের জন্য করণীয় কী? এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ কিছু পরামর্শ নিম্নে দেয়া হলো, যেগুলোর প্রয়োগ আপনার সন্তানের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক ফল এনে দিবে ইন শা আল্লাহ। আসুন জেনে নেয়া যাক সেগুলোর আংশিক কিছু তথ্য।

◈ ভালো গল্প শোনান, সহজ ভাষায়। নতুন কোন শব্দ বললে তার অর্থ বুঝিয়ে বলুন। তবে খেয়াল রাখবেন তা যেনো খুব বড়ো না হয়।

◈ নির্দিষ্ট সময় ধরে একই নিয়মে। কথাগুলো যেন মার্জিত হয়। বর্ণনামূলক সুন্দর গল্প হলে ভালো হয়। এটি শিশুর কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে দেবে। শিশু প্রতিদিনই নতুন নতুন শব্দ শিখতে চেষ্টা করবে।

◈ মনোযোগী শ্রোতা হন। শিশুর কৌতুহলকে প্রশ্রয় দিন। ওকে উৎসাহ দিন। বলা গল্পগুলোই ও বলতে চাইলে শুনুন। অথবা তাকে বলুন।

◈ যেসব জায়গায় ভুল করেছে তা সুন্দরভাবে নতুন কোন চেনা শব্দে পরিবর্তন করে দিন। হাসিচ্ছলে কথা বলুন।

◈ ভালো ফল পাবেন, ছড়া কবিতা মুখস্ত করালে। কবিতার ছন্দ মনে রাখার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা। শিশুরা এক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে। এটি ওর জানার, বলার গতিকে বাড়িয়ে দেবে। শব্দচয়নে, বাচনভঙ্গির স্পষ্টতা নির্ধারণেও কাজ দিবে।

◈ আপনার সন্তান যদি আধুনিক প্রযুক্তির মাঝে বড় হয়ে থাকে, তবে তাকে সেখান থেকে দূরে রাখবেন না। ইতিবাচক শিশুতোষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিকে তার নযর বাড়িয়ে দিন। তবে, আসক্তিতে ফেলবেন না। সবকিছু হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

◈ কথা বলার ধরণ, শব্দচয়ন, মাধুর্য, নম্রতা, সৌজন্য, এগুলোর জন্য প্রমাণিত টিপসসমূহ ব্যবহার করুন। ❑❑

সফর মাস; জানা অজানা কিছু কথা

আল-আমিন বিন আকমাল *

ভূমিকা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। হাজারো পাপ-পঙ্কিলতায় জড়িয়ে থাকা সত্বেও দয়া ও মায়ার চাদরে সদা আবৃত রেখেছেন। শান্তি কামনা করছি আল্লাহর থেকে পাওয়া মাকামে মাহমুদের সম্মানে ভূষিত নবিগণের সর্দার রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অবস্থান করছি ১৪৪৩ হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস সফর মাসে। বছরের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহুর্ত, দিন, সপ্তাহ, মাস বছরসহ প্রতিটি বস্তুই রবের দেওয়া আমাদের প্রতি এক ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি। ২০২১ সাল শেষ হলেই ২০২২ সাল যে চলছে এটা আমাদের কারো জানতে বাকি থাকে না। কিন্তু এখন যে চন্দ্র মাসের ১৪৪৩ হিজরী চলছে এটা মনে হয় আমাদের অনেকেই জানি না। বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের চিন্তাধারা শুধুই ইউরোপীয় সভ্যতার মড়কে আটকা পড়ে আছে। ইসলামী সংস্কৃতি, সভ্যতা এখন শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এর অনুশীলন নিতান্তই নগন্ন। চলুন ধাপে ধাপে জেনে আসি সফর মাসের যতসব রহস্য, গুরুত্ব, তাৎপর্য, মাহাত্ম ও মর্যাদার কিছু কথা।

সফর এর অর্থ ও নামকরণ:

আরবী সফর শব্দটিকে 'সিফর' মূল ধাতু থেকে নিলে এর অর্থ হবে খালি রিক্ত বা শূন্য। আর মূল ধাতু 'সফর নিলে এর অর্থ হবে হলুদ, হলদেটে, তামাটে, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, ঔজ্জ্বল্যশূন্য, দীপ্তহীন, রক্তশুন্য ইত্যাদি। জাহেলী যুগে এই মাসের নাম ছিলো নাজির। পরবর্তীতে এই মাসের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় সফর। কেন এই মাসের নাম সফর করা হলো, তা নিয়ে বেশ কিছু মতামত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মত হল:

* সম্মানিত, পবিত্র মুহাররম মাসকে জাহেলী যুগে আরবরাও সম্মান করতো। তাই এই মাসে তারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতো। সফর মাস আসলেই তারা বিভিন্ন অভিযানে যেত। আর এই মাসে তাদের ঘর-বাড়ী রিক্ত শূন্য ও খালি হয়ে পড়ে থাকতো বলে এই মাসকে সফর মাস বলা হয়।

* আরব দেশে এই সফর মাসে খরা হতো এবং খাদ্যাভাব আকাল ও মঙ্গা দেখা দিতো। মাঠঘাট শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত। ক্ষুধার্থ মানুষের চেহারাগুলো রক্তশূন্য ও ফ্যাকাশে হয়ে যেত। তাই তারা এই মাসকে সফর মাস বলতো।

* সফর মাসকে সুফরা মূল ধাতু থেকে নিলে এর অর্থ হয় হলুদ। আর এই সফর মাসে গাছের পাতাগুলো হলুদ হয় বলে এই মাসের নাম সফর মাস বলা হয়।

জাহেলী যুগে সফর মাস:

জাহেলী যুগে এই সফর মাসকে অনিষ্ট মাস বলা হতো। এই মাসকে তারা কুলক্ষণ মনে করতো। এই মাসে যে কোন ধরনের অকল্যান সবকিছুই তারা এই সফর মাসের দোহায় দিতো। এই মাসে জীবনের কোন কল্যান বয়ে নিয়ে আসে না এই বিশ্বাস তারা মনে প্রাণে লালন করতো। জাহেলী যুগের সেই উদ্ভট বিশ্বাসকে আজকের কিছু কিছু মুসলিম সমাজেও লালন করা হয়। অথচ এসব নিছক ধারনা ছাড়া আর কিছুই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সতর্ক করে বলেছন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم :لا عدوي ولا صفر ولا هامة ولا طيرة ولا نوء .

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন: সংক্রামন রোগ বলতে কিছুই নেই, সফর মাসের কোন কল্যান-অকল্যান নেই, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে পুণরজ্জীবন নেই, কোন অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই, তারকা নির্ধারনে কোন কল্যান-অকল্যান নেই।

তবে সবসময় মনে রাখতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাইলেই সবকিছু করতে পারেন। সংক্রামন রোগ বলতে কিছুই নাই এটা ঠিক কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই সংক্রামন হয়। আর এই বিশ্বাস রাখাই হল সালফে সালেহীনদের মানহাজ।

স্মরণীয় পাতায় সফর মাস:

সফর মাসে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত না থাকলেও এই মাসে ঘটে যাওয়া কিছু অবিস্মরণীয় ঘটনা এই মাসকে

দায়িত্বশীল, সহীহ তা'লীমুল কুরআন ও হিফয বিভাগ, বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড।

রেখেছে ইতিহাসের স্মরণীয় পাতায়। চলুন জেনে আসি কিছু ইতিহাস!

*** আবওয়ার যুদ্ধ:** এই আবওয়া যুদ্ধই হলো রাসূল ﷺ এর মাদানী জীবনের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধই তার জীবনের প্রথম যুদ্ধ। সফর মাসের ১২ তারিখে এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এই যুদ্ধে সা'আদ বিন উবাদাহও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

*** খয়বার বিজয়:** ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক বলেন: রাসূল ﷺ এই খয়বার মাসইে বিখ্যাত খয়বার নঘরী বিজয় করেন।

*** নাজদের যুদ্ধ:** ইবনে ইসহাক বলেন: রাসূল ﷺ যখন সুওয়কের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন তখন মুহাররম মাসের আর কয়েকটি দিন বাকি আছে।

*** বিখ্যাত সাহাবীদের ইসলাম গ্রহণ:** এই সফর মাসেই আমর ইবনুল আস, খালেদ বিন ওয়ালিদ, উসমান বিন ত্বলহা رضي الله عنهم র মতো বিখ্যাত সাহাবী এই মাসেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

*** মদীনায় হিজরত:** রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত শুরু করেন এই সফর মানে। আর হিজরত শেষ হয় রবিউল আওয়াল মাসে।

*** রাসূল ﷺ এর বিবাহ:** ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক বলেন: এই সফর মাসেই আল্লাহর রাসূল ﷺ খাদীজা বিনতে খুওয়লিদ رضي الله عنها কে বিবাহ করেন।

*** পারস্যের যুদ্ধ:** এই সফর মাসেই রাসূল সা; পারস্যের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ করেন।

*** রাসূল ﷺ এর অসুস্থতা:** যেই অসুস্ততায় আল্লাহর রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন সেই অসুস্থতা শুরু হয় এই সফর মাসে।

*** সিফ্ফীনের যুদ্ধ:** ঐতিহাসিক সিফ্ফীনের যুদ্ধ শুরু হয় এই সফর মাসে।

কিভাবে কাটাবেন সফর মাস:

এই সফর মাসে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত না থাকলেও প্রতি মাসেই রাসূল ﷺ এর শিক্ষা দেওয়া কিছ কিছু কিছু ইবাদত আছে যা পালন করলে রাব্বুল আলামীন তার বান্দার জন্য অঢেল সওয়াব দান করেন।

*** আইয়্যামে বীযের সিয়াম পালন:** আইয়্যামে বীয তথা চঁন্দ্র মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখে নফল সিয়াম পালন করা। এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم -أخبره قائلاً) :وإنّ بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيّامٍ، فإنّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنّ ذلكَ صِيَامُ الدّهْرِ كُلِّهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনেল আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বয়ং তাকে বলেছেন: প্রত্যেক মাসের তিনটি সিয়াম পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি পুণ্য কাজের প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দশ গুণ করে বাড়িয়ে দেন। আর এভাবেই তোমার প্রতিমাসের সিয়াম পালন এক বছর সিয়াম পালন করার সমপরিমান সওয়াব লেখা হবে।

*** সাপ্তাহিক সিয়াম:** আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন।

কেন রাখতেন এই সিয়াম.?

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দার আমল সমুহ পেশ করা হয়। আর আমার পছন্দ যে, আমার আমলসমূহ যেন সিয়াম অবস্থায় পেশ করা হয়।

*** বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা:** রাসূল ﷺ আমাদের বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: আমি প্রতিদিন ৭০ বার এরও অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি।

ইতি কথা:

সমাজে প্রচলিত যতসব কুসংস্কার সবকিছু রাসূল ﷺ এই কথায় ভূলে যেতে হবে।

لا عدوي ولا صفر ولا هامة ولا طيرة ولا نوء .

সংক্রামন রোগ বলতে কিছুই নেই, সফর মাসের কোন কল্যান-অকল্যান নেই, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে পুণরজ্জীবন নেই, কোন অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই, তারকা নির্ধারনে কোন কল্যান-অকল্যান নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এখন একটাই প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের সকলকে তারই দেখানো পথে অবিচল রাখেন। বর্তমান বৈরী পরিস্থিতিতে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে হেফাযত রাখেন। আমীন।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল *

সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও নারীর যে অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন দেখা যাচ্ছে, তা আরবের জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নারী জাতি এক অসহনীয় মর্যাদাহীন পরিস্থিতির শিকার। নির্যাতন, নারী পাচার, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের বিভৎস অত্যাচার প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী, হাসপাতালের অসুস্থ রোগিনী এমনকি মৃতা লাশ পর্যন্ত পাশবিকতার হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনাও এ সমাজে ঘটছে।

বিগত যুগেও নারী জাতি এমনিভাবে বিভিন্ন অজুহাতে ও কলা-কৌশলে নির্যাতিত হয়েছে। সে যুগের সমাজ নেতারা এর প্রতিরোধে কিছু কিছু চেষ্টাও করেছিলেন- যা প্রায় সকল যুগেই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে বিগত সভ্যতাগুলোতে নারীর দেওয়া মর্যাদার সাথে ইসলামের দেওয়া মর্যাদাকে আমরা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব।

১. গ্রীক যুগে নারীঃ

প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা তৎকালীন পৃথিবীর নেতৃত্ব দিত। কিন্তু নারীর মর্যাদা সেখানে ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গ্রীকদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে নারীকে 'মানুষের দঃখ কষ্টের মূল কারণ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই নোংরা আক্বীদা তাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ গ্রীক নাগরিকের নিকটে নারীর মর্যাদা ছিল ভূলুণ্ঠিত। অধিকাংশের নিকট বিয়ে একটি বোঝাস্বরূপ ছিল। নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব অতটুকুই ছিল যেমন পতিতালয়ের নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব। পতনযুগে গ্রীকরা আফ্রোদিত (APHRODITE) নামক প্রেম দেবীর পূজা শুরু করে। ফলে বেশ্যালয়গুলো উপাসনালয়ের ন্যায় উঁচু-নীচু সকলের জন্য সম্মেলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এভাবে নারীত্বের অবমাননার সাথে সাথে গ্রীক সভ্যতার মৃত্যুঘণ্টা বেজে যায়।

২. রোমান সভ্যতায় নারীঃ

গ্রীকদের পরেই ইতিহাসে রোমান সভ্যতার স্থান। তাদের উন্নতির যুগে নারীর সতীত্ব ও সম্মানকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখা হতো। সেখানে বিবাহ ও পর্দাপ্রথা চালু ছিল। বেশ্যাবৃত্তি চালু থাকলেও লোকেরা এটাকে খুবই ঘৃণা করত।

কিন্তু বস্তুগত উন্নতির চরম শিখরে উঠে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায় এবং নারীদেরকে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে স্বাধীনতার নামে বের করে নিয়ে আসে। পুরুষের পাশাপাশি তাদেরকে কর্মজগতে নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে চরম স্বেচ্ছাচার। দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। বিচ্ছেদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়তে থাকে। বিবাহ এক সময় সামাজিক চুক্তির রূপ ধারণ করে যা যেকোন সময় ভঙ্গ করা চলে। স্ত্রীরা যেকোন সময় চুক্তি বাতিল করে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহের চুক্তি শুরু করে। পাদ্রী জুরুম (৩৪০-৪২০ খ্রীঃ) বিগত যুগের একজন নারীর কথা বলেন, যে ৩২ জন পুরুষের সাথে বিবাহ করেছে এবং সে তার শেষ স্বামীর ২১তম স্ত্রী ছিল। সমাজের নেতারা এসব বিয়েকে 'ভদ্র যেনা' গণ্য করতেন। রোম সমাজের নৈতিকতা বিষয়ক ইনস্পেক্টর জেনারেল কাতো (CATO) বিষয়টি স্বীকার করেন এবং সমাজের স্বেচ্ছাচারমূলক বহু বিবাহ প্রথাকে 'মন্দ কাজ নয়' বলে মন্তব্য করেন। এভাবে যেনার ছড়াছড়িতে রোমানদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়- যা তাদের সভ্যতার পতন ডেকে আনে।

৩. ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের নিকট নারীঃ

রোমানদের পতনের পর ঈসায়ী ধর্ম ইউরোপীয়দের নিকট প্রসার লাভ করে। রোমানদের পতনদশা তাদের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। সে কারণে তারা নারী সঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। পাদ্রীরা ঈসায়ী ধর্মের মুখপাত্রের দাবি নিয়ে ঘোষণা করেন যে, নারী হল সকল পাপের উৎস এবং মানব জাতির অভিশাপ। তারতুলিয়ান,

* *অধ্যক্ষ, জামি'আহ দারুল ইহ্সান আল আরাবিয়্যাহ কালনী, গোবিন্দপুর, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ*

ক্রিসোসতাম প্রমুখ পাদ্রী নেতারা এই ঘোষণা দিয়ে বিয়েকে যদিও হালাল রাখেন, তথাপিও এটাকে বিধিবদ্ধ যেনা হিসেবে নিন্দনীয় মনে করেন।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে প্রচারিত এ চরমপন্থী মতবাদ সমস্ত খ্রিষ্টান জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নারীর প্রায় সকল অধিকার হরন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত এই অবস্থা কমবেশি চালু থাকে। কিন্তু এই চরমপন্থী ব্যবস্থা বেশিদিন টেকেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আবার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং স্বাধীনতার পক্ষে তারা পাল্টা চরমপন্থী কিছু নীতি চালু করে। যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধান নিশ্চিতকরার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু উভয় নীতিই ছিল চরমপন্থী এবং মানুষের স্বভাবধর্ম বিরোধী। ফলে পূর্বেকার বিদ্ধস্ত সভ্যতাগুলোর ন্যায় খ্রিষ্টানি সভ্যতাও যৌন স্বেচ্ছাচারে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে গেল। আধুনিক প্রযুক্তি তাদেরকে এ ব্যাপারে আরো উৎসাহ যোগাচ্ছে। গর্ভপাত সেখানে আইনসিদ্ধ হয়েছে। কুমারী মাতা এখন আর কোন লজ্জার ব্যাপার নয়। 'কলগার্ল' সে দেশের সভ্যতার অংশ। তাদের সাহিত্য যৌনতায় ভরে গেছে। নগ্নতা এখন সাংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গেছে। বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা প্রকারান্তরে নারীত্বের অমর্যাদার শামিল। তাই বলা চলে যে, বর্তমানের খ্রিষ্টানী বা আধুনিক সভ্যতা তাদের পূর্বসুরী রোমক ও গ্রীকদের ন্যায় ক্রমেই ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে।

৪. কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী বিশ্বে নারীর মর্যাদাঃ

বর্তমান যুগে কমিউনিষ্ট বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা মূলতঃ ইরানের প্রাচীন 'মাযদাকী' মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বাদশাহ নওশেরওয়ার পিতা কোবাদ এর আমলে "মাযদাক" নামক জনৈক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন যে, মানব সমাজে সকল অশান্তির মূল কারণ হলো নারী ও অর্থ-সম্পদ। অতএব এই দুটি বস্তু ব্যক্তি মালিকানা থেকে বের করে জাতীয় মালিকানায় থাকতে হবে। আগুন, পানি ও মাটিতে যেমন সকলের আধিকার আছে, নারী ও সম্পদেও তেমনি সকলের সমান অধিকার থাকবে। বর্তমান সমাজতন্ত্রী বিশ্বে সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। নারীর অবস্থা সেখানে মাযদাকী আমলের চেয়ে খুব একটা পৃথক নয়। বিবাহ প্রথাটি যদিও সেখানে চালু আছে, তবুও ঘুনে ধরা কাঠের মতই ক্ষণভঙ্গুর। ফলে নারীর মর্যাদা সেখানে ক্রমেই ভোগ্যপণ্যের অবস্থায় উপনীত হচ্ছে।

৫. ইহুদী, ব্যাবিলনীয়, পারস্য ও হিন্দু সভ্যতায় নারীঃ

ইহুদীদের ধারণামতে মা 'হাওয়া' ছিলেন "মানব জাতির সকল দুঃখ কষ্টের মূল"। এ ভুল ধারণাই ইহুদী সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ফলে তাদের সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

গ্রীক সভ্যতার চরম অধঃপতন যুগে ব্যাবিলনীয় ও পারসিক সভ্যতায় ব্যাপক ধস নেমে আসে। ব্যাবিলনীয়দের মাঝে ব্যভিচার সাধারণ রূপ ধারণ করে। পারসিকদের মধ্যে 'মাযদাকি' মতবাদের প্রসার ঘটে। একই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে 'বামমার্গী' নামক চরম নোংরা ধর্মীয় মতবাদ চালু হয়। যেখানে নারীরা পরকালীন মুক্তির ধোকায় পড়ে নিজেরা এসে ঐসব বামমার্গী সাধুদের বাড়ীতে ও মন্দিরে দেহদানে লিপ্ত হত। হিন্দুদের নিকট গ্রীকদের ন্যায় নারীরা 'পাপাত্মা' বলে কথিত ছিল। সে কারণে তাদেরকে সম্পত্তির অধিকার, বিধবা বিবাহের অধিকার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি স্বামীহারা নারীকে ধর্মের নামে মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বিধানও চালু করা হয়। যা 'সতীদাহ' প্রথা নামে পরিচিত। নারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ নিষিদ্ধ করা হয়। গান্ধর্ব্য বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, শিবলিঙ্গ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নারীকে স্রেফ ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে। যা কমবেশী আজও চালু আছে।

৬. প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের নিকটে নারীঃ

ইসলাম আসার প্রাক্কালে আরবীয় মহিলা সমাজে দুটি স্তর ছিল। **(ক) উচ্চস্তরের মহিলাঃ** এরা ছিলেন কবিতা, বীরত্ব, চিকিৎসা, বক্তৃতা, জ্ঞানবত্তার দিক দিয়ে সকলের নিকটে শ্রদ্ধার পাত্রী। মা খাদীজা এই স্তরেরই একজন স্বনামধন্যা বিদুষী মহিলা ছিলেন। **(খ) সাধারণ স্তরের মহিলাঃ** এ স্তরের মহিলারাই ছিলেন সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের অবস্থা বিগত পতিত সভ্যতাগুলোর চাইতে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও অধঃপতিত ছিল। যার জন্য কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়া বাবা মায়ের নিকট খুবই দুঃখের কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হত। অনেকে এজন্য কন্যা জন্মের সাথেসাথে মাটিতে পুঁতে বা কুয়ায় ফেলে মেরে ফেলত।[১১৮] সমাজে মেয়েদের কোন অধিকার স্বীকৃত

১ *সূরা নাহল আয়াত: ৫৮, সূরা তাকভীর আয়াত: ৮-৯*

ছিল না। বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার সবই ছিল পুরুষের একচেটিয়া। ঠিকা বিবাহ, বহু বিবাহ, বদলী বিবাহ, মা ব্যতীত অন্যান্য সকল মহিলাকে বিবাহ করা প্রভৃতি নোংরামি চালু ছিল। অধিকাংশ নারীকেই সমাজে অধিকারহীন ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হত। যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকহারে চালু ছিল। ফলে সাধারণভাবে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবেই ব্যবহার করা হত।

৭. ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ

তৎকালীন পৃথিবীর উপরোক্ত সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীর জন্য স্থায়ী মর্যাদার গ্যারান্টি দিয়ে ঘোষণা করেন যে هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ "নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের পোষাক সমতুল্য।"[১১৯] একটি গাড়ীতে যেমন দুটি চাকার প্রয়োজন, কিন্তু দুটি চাকা স্ব স্ব স্থান থেকে সরে গিয়ে একত্রিত হয় তাহলে যেমন অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া স্বাভাবিক তেমনি নারী ও পুরুষ উভয়ে নিরাপদ দুরত্বে পর্দায় অবস্থান করে সভ্যতার গাড়ী গতিশীল রাখবে। আল্লাহ বললেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে অধিকতর তাক্বওয়ার অধিকারী।"[১২০] যেনা-ব্যভিচার, ঠিকা বিবাহ, বদলী বিবাহ সবই হারাম বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। পুরুষের ন্যায় নারীকেও স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাইয়ের সম্পত্তিতে অংশীদার করা হল। তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ফরয ঘোষণা করা হল। ১৪ জন মহিলার সাথে বিবাহ হারাম করে তাদের ইজ্জতের গ্যারান্টি দেওয়া হল। ক্রীতদাসীকে মুক্তি দিয়ে বিবাহের মাধ্যমে সম্মানিত জীবন যাপন করাকে অধিক সাওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করা হল। বিবাহের ব্যাপারে যাবতীয় জাহেলী রেওয়াজ বাতিল করে নারীর সম্মতি গ্রহণ, তাকে মোহরানা প্রদান এবং অলী ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ বাধ্যতামূলক করার ফলে তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হল। তাদেরকে খোলা তালাক ও বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হল। 'নারী সকল অকল্যাণের মূল' এ জহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হল যে, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "আমরা মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছি।"[১২১] অতপর নারীর উপর পুরুষের যে কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ইসলাম ঘোষণা করেছে, তা মূলতঃ সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নয়। রসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।[১২২] মোটকথা ইসলাম বিগত সভ্যতাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে নারীকে সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করে। ইসলামের নিকট নারী অকল্যাণকর নয়, ভোগের সামগ্রীও নয়, বরং তা সমাজের অগ্রগতিতে ও সুখে-দুঃখে পুরুষের বিশ্বস্ত ও অপরিহার্য সঙ্গিনী। এভাবে যে ইসলাম নারী জাতিকে জাহেলিয়াতের জিঞ্জির হতে মুক্ত করে এক অভাবনীয় জীবন বোধের সন্ধান দিল এবং তার ফলে মা, খালা, বোন, ফুফু, কন্যা ইত্যাদি হিসেবে যে মহান আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে পুরুষ সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করল। সেই ইলাহী বিধানকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রগতির ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে মর্যাদার পর্দা দূরে ছুড়ে ফেলে নারী সমাজ আজ বাইরে বেরিয়ে আসছে। আল্লাহ প্রদত্ত নিজের গোপন সৌন্দর্যকে স্বাধীনতা ও ফ্যাশনের নামে পুরুষের সামনে মেলে ধরছে। ফলে আগুন আর মোমের যে অবস্থা আজকের সমাজে স্বাভাবিকভাবে তাই-ই ঘটছে। রোমান সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, হেলেনীয় সভ্যতা প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলো ধ্বংসের মূল বীজ হিসেবে নারী যেভাবে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল, আজকের আধুনিক সভ্যতা ধ্বংসের জন্য তথাকথিত প্রগতিবাদী নারীরাই যে দায়ী হবে, তার লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পর্দাহীন নারী রাস্তায় চলবে, পাশাপাশি চেয়ারে বসে চাকরি করবে, আর পুরুষ সহকর্মী তার দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না এটা নিতান্তই বাস্তবতা বিরোধী কথা। আর সে কারণেই সমাজে ঘটছে যত অঘটন। আধুনিক যুগে নারী এখন সাধারণ পণ্যের চেয়েও সস্তা। সে এখন বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির হাতিয়ার, সার্কাস সিনেমাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধাণ আকর্ষণ। নারী এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নারীই আজ চরম নির্যাতনের শিকার। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য দূরদর্শী পুরুষ সমাজকে যেমন এগিয়ে আসা প্রয়োজন, তেমনি আত্মমর্যাদাহীন চলন্ত শোকেসসাদৃশ বেপর্দা নারী সমাজকে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া সর্বাধিক জরুরি। ইসলাম নারীকে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে ও সেই মোতাবেক তাকে সমাজ জীবনে চলার জন্য কিছু স্থায়ী নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা ও নিয়ম পদ্ধতির কঠোর অনুশীলন ও অনুসরণ ব্যতীত

২ সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৭
৩ সূরা হুজুরাত আয়াত: ১৩
৪ সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত: ৭০
৫ সহীহ মুসলিম

সমাজে নারী তার মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। শুধু যে কঠোর আইন রচনা দ্বারা নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়, বিগত এরশাদের আমলে ও বেগম জিয়ার আমলে তার বাস্তব প্রমাণ দেখা গেছে।

সুতরাং যতদিন নারী তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করার মানসিকতা অর্জন করতে না পারবে, যতদিন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমে চরিত্রে, ব্যবহারে, আচার-আচরণে, গভীর আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় দিতে না পারবে, যতদিন সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ, উভয়ের কর্মস্থল পৃথক, রেডিও-টিভিতে ও পত্র-পত্রিকা-চলচ্চিত্রে চরিত্র বিধ্বংসী প্রচার বন্ধ না হবে, ততদিন নারী সমাজ তার সম্মানজনক স্থানে পৌঁছাতে পারবে না।

অতএব আসুন! পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করি এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি। আমরা যেন আমাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে প্রাথমিক যুগের মুসলিম নারীদের ন্যায় শক্তিমান আদর্শবান নারী হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, আল্লাহর নিকট কায়মনোচিত্তে সেই প্রার্থনা করি। আল্লাহ আমাদের মনের আশা পূর্ণ করে আমাদের সমাজকে একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল সমাজ হিসেবে কবুল করুন। আমীন!!!!

ব্যায়াম-সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ

জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো ব্যায়াম। কেন? স্রষ্টা এমনভাবে মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন যে, পরিশ্রম করলে আপনি ভালো থাকবেন। পবিত্র কোরআনে সূরা বালাদের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।'

অথচ ভালো থাকার নামে আমরা আজ আরাম-আয়েশে ডুবে গিয়েছি। হয়ে পড়েছি শ্রমবিমুখ। কায়িক শ্রমকে আমরা গুরুত্বহীন মনে করছি। কিন্তু চারপাশে একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, যারা শারীরিক পরিশ্রম করছেন, দিনরাত নানা রকম পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন, যেমন : দিনমজুর কৃষক রিকশাওয়ালা ইত্যাদি, তারাই তুলনামূলক ভালো আছেন। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক-এ জাতীয় রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছেন একেবারেই কম।

আধুনিক নগরজীবনে আমরা আরাম-আয়েশের অসংখ্য উপকরণের মাঝে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, দিনের পর দিন আমাদের কায়িক পরিশ্রম করার সুযোগ হয় না। কিন্তু সুস্থ থাকতে হলে শারীরিক শ্রমের কোনো বিকল্প নেই। তাই সচেতনভাবে ও পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। যদি সুস্থ থাকতে চাই। আর এই সচেতন ও পরিকল্পিত পরিশ্রমটাই হতে পারে ব্যায়াম।

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় তথা সার্বিক সুস্থতার জন্যে প্রতিদিন কমপক্ষে একঘণ্টা ব্যায়াম করা উচিত। তবে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়াম করলেই কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন ব্যায়াম সবচেয়ে উপকারী?

ব্যায়াম মূলত তিন ধরনের

অ্যারোবিক (হাঁটা জগিং সাইক্লিং সাঁতার ইত্যাদি)

অ্যানারোবিক (ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সারসাইজ)

ইয়োগা (যোগব্যায়াম)

তিন ধরনের ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী ব্যায়াম ইয়োগা। তবে পরিপূর্ণ উপকার পেতে চাইলে কিছু সময় জোরে জোরে হাঁটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, ওজন নিয়ন্ত্রণ তথা সার্বিক ফিটনেসের জন্যে প্রতিদিন ৩০ মিনিট ইয়োগা করুন এবং ঘণ্টায় চার মাইল বেগে কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটুন ও কিছুক্ষণ জগিং করুন।

(হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, শীর্ষক বই থেকে নেয়া)

বন্ধকি জমি ভোগ দখল সংক্রান্ত ইসলামী আইন

মেহেদী হাসান সাকিফ★

বর্তমানে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে ফসলি জমি বন্ধক রাখার এবং শহরে ফ্ল্যাট বন্ধক রাখার বিষয়টি খুবই প্রচলিত। বন্ধক রাখার পরে সাধারণত বন্ধকগ্রহীতা (যিনি টাকা ধার দিয়েছেন) টাকা পাওয়ার আগ পর্যন্ত নিদিষ্ট সময় অবধি চুক্তি অনুযায়ী সেই জমি, ফ্ল্যাট ভোগ করে থাকেন। এরপর চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন তার সবটাই ফেরত নিয়ে জমি ফেরত দেন।

অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণদাতা তার প্রদত্ত ঋণ পরিমাণ অর্থ/সম্পদ ছাড়া ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে বাড়তি কোন সম্পদ বা সুবিধা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাই উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যত টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে তত টাকা ফেরত নেয়ার পাশপাশি অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে জমি বা ফ্ল্যাট ভোগ করাটা নিশ্চিতভাবেই সুদের অন্তর্ভুক্ত এবং অকাট্যভাবে হারাম। এমনকি বন্ধকদাতা (যিনি জমি/ফ্ল্যাট জমা রেখে ঋণ নিয়েছেন) ভোগের অনুমতি দিলেও ঋণদাতা সেটা ভোগ করতে পারবে না। কারণ বন্ধকি জমি থেকে বন্ধকগ্রহীতা কোনো ধরনের সুবিধা গ্রহণ করাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে সুদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত। (বাদায়েউস সানায়ে)

তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর নিয়ম হচ্ছে বন্ধকদাতা জমি/ফ্ল্যাট এর দলিল বন্ধক দিয়ে টাকা গ্রহণ করবেন সরাসরি জমি/ফ্ল্যাট নয়।

বিশিষ্ট তাবেয়ী আল্লামা ইবনে সিরিন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি আমার কাছে একটি ঘোড়া বন্ধক রেখেছে এবং তা আমি আরোহণের কাজে ব্যবহার করেছি। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি আরোহণের মাধ্যমে এর থেকে যে উপকার লাভ করেছ তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।[১২৩]

বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম কাজি শুরাইহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সুদ কিভাবে পান করা হয়ে থাকে? তিনি বলেন, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি গাভির দুধ পান করা সুদ পানের অন্তর্ভুক্ত।[১২৪]

 # গতানুগতিক বন্ধকী জমি/ফ্ল্যাট হালাল পদ্ধতিতে ভোগ করার উপায় : বন্ধকি জমি থেকে বন্ধকগ্রহীতা উপকৃত হতে চাইলে বন্ধক চুক্তির বাইরে আলাদাভাবে ঋণগ্রহীতার সাথে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। অর্থাৎ যত দিন পর্যন্ত ঋণের টাকা শোধ না হয় তার অনুমান করে সেই মেয়াদে (অথবা সে যতদিন ভোগ করতে চায় ততদিনের মেয়াদে) ঋণদাতা জমিটি ইজারা (অর্থাৎ ভাড়া) পদ্ধতিতে তা ভোগ করবে এবং তার ন্যায্য ভাড়াও মালিককে আদায় করবে। (তবে ঋণগ্রহীতাকে ইজারা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য করা যাবে না) এ ক্ষেত্রে ঋণ ও ইজারা চুক্তি দুটি ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে, দুটি চুক্তিকে মিলিয়ে একটি অপরটির ওপর শর্তযুক্ত হতে পারবে না। অর্থাৎ বন্ধক রেখে ঋণ নিতে হলে জমি/ফ্ল্যাটটা ইজারায় দিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না।[১২৫]

এবার উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য একটা উদাহরণ পেশ করছি।

মনে করুন, একজন ব্যক্তি তার ফ্ল্যাট বন্ধক দিয়ে এক লাখ টাকা গ্রহণ করলেন। তার সেই ফ্লাটের স্বাভাবিক প্রচলিত ভাড়া আছে প্রতিমাসে দশ হাজার টাকা। বন্ধকগ্রহিতা (ঋণদাতা) ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিতে চাইলে বন্ধকদাতার সাথে আলাদাভাবে দশমাসের জন্য ভাড়ার একটি চুক্তি করতে পারেন।

দশমাস শেষ হওয়ার পর ভাড়া বাবদ এক লাখ টাকা কেটে যাবে এবং দুইজনের চুক্তির সমাপ্তি ঘটবে।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, ভাড়ার পরিমাণ অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও প্রচলিত পরিমাণে হতে হবে। হিলা বাহানাস্বরূপ অস্বাভাবিক কমিয়ে নামমাত্র মূল্যে ইজারা চুক্তি হলে জায়েজ হবে না। কারণ এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাত্রায় ভাড়া কমানোটাও ঋণের বিনিময়ে নেয়া অতিরিক্ত সুবিধা বলে বিবেচিত হবে। ❑❑

★লেখক: মেহেদী হাসান সাকিফ, লেখক প্রাবন্ধিক দৈনিক যুগান্তর ও আলোকিত বাংলাদেশ।

[১২৩] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: ১৫০৭১

[১২৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: ১৫০৬৯

[১২৫] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৪৬৫, ইমদাদুল আহকাম ৩/৫১৮

কবিতার সমাহার

الأبيات الشعرية

প্রার্থনা

মোঃ গিয়াস উদ্দিন★

হে আল্লাহ, তুমি মোর সৃষ্টিকর্তা, তুমি শক্তি,
তুমি ছাড়া মোর জীবনের নাই পাপ মুক্তি।
তোমার দয়ায় আমি বেঁচে আছি, চলি ফিরি,
তোমার ইচ্ছায় শত্রুর সাথে জিহাদ করি।

হে আল্লাহ, তুমি দাও মোরে নিখুঁত ঈমান,
সুন্দর স্বাস্থ্য, রহমত বিপুল পরিমাণ।
বুক ভরা দাও আশা নিরাশাকে ভালোবাসা,
দাও সফলতা দূর কর সকল হতাশা।

প্রভু, এমন নে'মাত দাও যা শেষ হয় না,
চক্ষুশীতলতা দাও যা কখনো ফুরায় না।
তব ফায়সালায় যেন খুশীর স্বাদ পাই,
মৃত্যুর পর আমি সুখ নয় জীবন চাই।

প্রভু, দেহের গঠন মোর করেছ সুন্দর,
তেমনি আমার স্বভাবকে কর মনোহর।
তাওফিক দাও মোর দৃষ্টি রাখি সংযত,
নিজের সততায় থাকি সর্বদাই জাগ্রত।

হে আল্লাহ, দূর কর মোর অন্তরে ক্রোধ,
প্রাচুর্য্য দাও, সকল ঋণ করি পরিশোধ,
এলোমেলো জীবন আমার কর সুশৃঙ্খল,
কবুল কর তুমি আমার সকল আমল।

আমি চাই

মুহাম্মাদ ইবনে মিজান★

যেতে চাই আমি চৌদ্দশত বছর আগে
যেতে চাই প্রাণের নবি ﷺ-এর কাছে,
দেখতে চাই প্রাণভরে প্রিয় নবি ﷺ-কে
হাঁটতে নবি ﷺ-এর সাথে মক্কা-মদিনাতে।
শুনতে চাই নবি ﷺ-এর সত্যের আহ্বান
শুনতে চাই আমি বিলাল رضي الله عنه-এর আযান,
পড়তে চাই নবি ﷺ-এর সাথে নামাজ
দেখতে চাই আমি মদিনার ইসলামি সমাজ।
আবু বকর رضي الله عنه, উমর رضي الله عنه, আলি رضي الله عنه-এর সাথে
বসতে চাই আমি নবি ﷺ-এর পাশে,
যেতে চাই বীর সেনানীদের সাথে
বদর, খন্দক, উহুদ, খায়বার যুদ্ধে।
জানি, এ জীবনে এটি সম্ভব নয়
তবুও চায় আমার ব্যাকুল হৃদয়।
তাই তো চাই আমি থাকতে
নবি ﷺ-এর সাথে জান্নাহ,
কবুল কর তুমি মহান আল্লাহ।

"বিধ্বস্ত মানবতা"

মুজাহিদ বিন আব্দুল বারী★

দেখিনু সেদিন রেল লাইনের ধারে
কাঁপছে ছেলেটি থর থর করে!
ধীরে ধীরে গেলাম কাছে, বললাম
ওহে বাছা কাঁপিতেছ কেন এভাবে?
কহিল বাবু! শীতে হয়েছি যে কাবু,
কাঁপিতেছি এভাবে বস্ত্রের অভাবে!
ক্ষুধার তাড়নায় তার পেট ও পিঠ
হয়েছে যে একাকার!
খাবারের কথা জিগালে, কহিল দিন কয়েক ধরে
রয়েছি যে অনাহার!!

আহ! মোরা মানবতার গান গাই!
কত মানুষ রয়েছে ডাস্টবিনের পাশে
খাবার খুঁজছে কালো কাকগুলোর সাথে!
তাহা কি মোরা দেখিতে পাই?
দেখিবো কেন, কেনই বা দাঁড়াবো ওদের পাশে,
শরীর থেকে যে ওদের দুর্গন্ধ আসে!
দেখিলেও দূর হতে নাকটি চেপে চলে যাই
মাঠে মঞ্চে মোরা মানবতার গান গাই!!

যে ছেলে থাকার কথা আজ পাঠশালায়
সে কেন শ্রমিক আমার কারখানায়,
দেশে কি শিশুশ্রম বিরোধী আইন নেই?
মোদের মুখে কি মানবতার কথা শোভা পায়!
মানবতা মানবতা আজ শুধুই মুখের কথা,
বিজয়ী স্বার্থপরতা! বিধ্বস্ত মানবতা!!

★ ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা
★ দেবিগঞ্জ,পঞ্চগড়
★ কুল্লিয়া প্রথম বর্ষ, এম এম আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ **প্রশ্ন (১)** *আমার বাবার মৃত্যুর পর বাড়ীর পাশেই কবরস্থ করেছিলাম। বাড়ীর পাশে অন্যের বাড়ী হওয়ায় তাদের চলাফেরা, বাড়ীর গবাদী পশুর বিচরণ বাবার কবরের পাশ দিয়েই হচ্ছে। কোনো কোনো সময় কবরের ওপর দিয়েও হয়। এ মুহূর্তে বাবার কবর স্থানান্তর করতে পারি কি? বা এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী?*

আহসান হাবিব, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

উত্তর: মুসলিম ব্যক্তি জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় সম্মানিত। সুতরাং সর্বাবস্থায় মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্টমুক্ত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»

মৃত ব্যক্তির হাড়ে আঘাত করা বা ভেঙে দেয়া জীবিতবস্থায় ভেঙে দেয়ার ন্যায়।[১]

অতএব, মৃত ব্যক্তিকে কষ্টমুক্ত রাখার লক্ষেই দাফনের পরে কবর ভেঙে ফেলা বা স্থানান্তর করা সাধারণত নিষিদ্ধ। তবে মৃত ব্যক্তির প্রয়োজন তথা তার সম্মান রক্ষার্থে কবর স্থানান্তর করা জায়েয রয়েছে।[২]

সুতরাং আপনার বাবার কবর যেহেতু নির্দিষ্ট কবরস্থানে নয় এবং কবরের পবিত্রতা রক্ষাও সম্ভব হচ্ছে না এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির প্রয়োজনে উক্ত জায়গা হতে কোন মসুলিম কবরস্থানে স্থানান্তর করা যেতে পারে। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলাম।

☞ **প্রশ্ন (২) :** *বর্তমানে অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, বজ্রপাতে যারা মৃত্যুবরণ করছে তাদের লাশ চুরি হওয়ার ভয়ে কবর পাকা করা হচ্ছে, এটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?*

মাসুম বিল্লাহ, নকলা, শেরপুর

উত্তর: মুসলিম মৃত ব্যক্তির দেহ যথাসম্ভব সম্মানের সাথে সংরক্ষণ ও দাফন করতে হবে। কিন্তু এমন নয় যে, পাকা ঘর নির্মাণ করে সংরক্ষণ করতে হবে। লাশ চুরি হতে সম্ভব অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিবে। তবে এজন্য কবরে স্থাপনা তৈরি করা বৈধ হবে না। হাদীসে এসেছে, আলী رضي الله عنه বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি যেন উঁচু কবর ভেঙে সমতল করে দেই।[৩]

☞ **প্রশ্ন (৩) :** *অনেক জায়গায় দেখেছি বাড়ীর পাশে কবরস্থান। সেই কবরস্থানের কোনো সম্মান নেই, এমন কি অনেক কবরের উপর চাষ করে সেখানে বিভিন্ন আবাদও করছে, এই আবাদ করা যাবে কি? এর বৈধতা কতটুকু?*

সাদ্দাম হুসাইন, চিলমারী, কুড়িগ্রাম

উত্তর: মুসলিম কবরস্থানকে সম্মান করা অপরিহার্য। কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিদের মানহানিকর কোন কিছু করা হারাম।[৪] অনুরূপ কবর বহাল থাকাবস্থায় কবরস্থানে চাষাবাদ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।[৫]

☞ **প্রশ্ন (৪) :** *আমাদের পরিবারে দাদা ও বাবা মারা গেছেন; দাদী এখনও জীবিত আছেন। দাদার রেখে যাওয়া সম্পদে আমার বাবার ভাগটুকু আমার পাওয়ার বৈধতা কতটুকু বা আমি কিভাবে পেতে পারি?*

খলিলুর রহমান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

উত্তর: দাদা যদি বাবার আগেই মারা যায় তাহলে বাবা দাদার সন্তান হিসেবে ওয়ারিস হবেন। অতঃপর বাবা মারা যাওয়ায় আপনি বাবার সন্তান হিসেবে সম্পদের ওয়ারিস হবেন। আর যদি বাবা আগে মারা যায় অতঃপর দাদা মারা যায় তাহলে এমতাবস্থায় আপনি দাদার সম্পদের ওয়ারিস হবেন না। তবে অন্য ওয়ারিসগণ যদি সদয় হয়ে কিছু দান করে তা ভিন্ন কথা। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলাম।

☞ **প্রশ্ন (৫) :** *বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের দীনদারিতা দেখার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনা রয়েছে। ছেলে বা মেয়ের দীনদারী কিভাবে যাচাই করবো এবং সর্বনিম্ন দীনদারীর নিদর্শন কী?*

হাফিজুর রহমান, সদর, ময়মনসিংহ

---

[১] *আবূ দাউদ হা: ৩২০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান হা: ৩১৬৭*
[২] *সহীহ বুখারী হা : ১৩৫১, মাজমু ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়াহ ২৪/৩০৩ পৃ. সাউদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড ৫/২৪১ পৃ.*
[৩] *সহীহ মুসলিম হা : ৯৬৯, আবূ দাউদ হা : ৩২১৮*
[৪] *আবূ দাউদ হা : ৩২০৭, ইবনু মাজাহ হা : ১৬১৭ সহীহ*
[৫] *সউদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড ফাতাওয়া নং-২১৭৪*

উত্তর : ছেলে বা মেয়ের দীনদারী যাচাই করার মূল বিষয় হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে নেয়া এবং কমপক্ষে ইসলামের ফরয-ওয়াজিব বিষয়সমূহ পালন করা।

এছাড়াও ছেলের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ،

তোমাদের কাছে যখন এমন ছেলে আসবে যার দীন ও আদর্শে তোমরা সন্তুষ্ট হবে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দাও।[৬] মেয়ের ক্ষেত্রে বলেন :

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

উত্তম নারী হলো তার প্রতি স্বামী দৃষ্টি দিলে তাকে খুশি করবে, নির্দেশ দিলে আনুগত্য করবে এবং তার জান-মালে স্বামীর অপছন্দনীয় কিছু থাকবে না।[৭]

এছাড়াও ছেলে ও মেয়ের পরিবারের ধর্মীয় অবস্থা থেকেও যাচাইয়ের বিষয় রয়েছে। ওয়াল্লাহ আলাম।

☞ প্রশ্ন (৬) : *আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক এন, জি, ও সংস্থা আছে। এসব সংস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বই, খাতা, কলম, পোশাক-পরিচ্ছদসহ মাসিক ভাতা, বাৎসরিক ভাতা, স্কুলে যাতায়াত খরচ, বাবা-মায়ের জন্য বাৎসরিক উপঢৌকনসহ বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা কী?*

সামছুদ্দীন, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

উত্তর এনজিওগুলো বাহ্যিকভাবে সেবার কথা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেবার পেছনে তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। অনেক এনজিও খ্রিষ্টান মিশনারীর কাজ করে থাকে। অতএব যারা একজন ছাত্রের পেছনে এত ব্যয় করবে তাদের ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য থাকবে এটাই বাস্তব। যদি এর পেছনে উদ্দেশ্য হয় ঈমান-ইসলাম হতে ভিন্নমুখী করা, তাহলে ঐসব সুবিধা বর্জন করে ঈমান-ইসলাম সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

[৬] *তিরমিযী হা: ১০৮৪, ইবনু মাজাহ হা: ১৯৬৭ (হাসান)*
[৭] *সহীহাহ হা: ১৮৩৮*

☞ প্রশ্ন (৭) : *বর্তমানে কিছু কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ টিকা গ্রহণের ব্যাপারে অনুৎসাহিত করছেন, এ ব্যাপারে ইসলামের আলোকে সমাধান চাই।*

সৈয়দ আহমাদ, বিরল, দিনাজপুর

উত্তর টিকা গ্রহণের ব্যাপারে নিরুৎসাহের দুটি কারণ হতে পারে : এক. রোগ না হতেই অগ্রিম চিকিৎসা গ্রহণ করা, দুই. অমুসলিমদের আবিষ্কৃত টিকা মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর: ইসলামী শরীয়াতে অগ্রীম চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধ, যেমন : আমরা প্রত্যহ সকালে সারাদিনের রোগ-মুসিবতের বিপদ হতে আত্মরক্ষার জন্য অগ্রীম দু'আ-অযীফা পাঠ করে থাকি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, যদি মুসলিম চিকিৎসক টিকা ক্ষতিকারক নয় এমন সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এছাড়াও অমুসলিমদের তৈরি বহু টিকা ও ঔষধ আমরা নিয়মিত গ্রহণ করে থাকি। অতএব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে টিকা গ্রহণ করলেই আপনি রোগমুক্ত হয়ে গেলেন এমন নয়। এটা একটা সতর্কতা অবলম্বনমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাহায্য ও নিরাপত্তাই হলো আসল। ওয়াল্লাহু তাআলা আলাম।

☞ প্রশ্ন (৮) : *আমি একজন বিবাহিত পুরুষ। আমার স্ত্রীর মাধ্যমে আমি তিন সন্তানের জনক। তিনটি সন্তানই ডাক্তারের পরামর্শে সিজারের মাধ্যমে করতে হয়েছে। আমি চাইলেও তার মাধ্যমে চতুর্থ সন্তানের বাবা হতে পারব না। যদিও আমি সন্তান নিতে পুরোপুরি সক্ষম। এহেন পরিস্থিতে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে আমার অনুমতি নেওয়া কতটুকু জরুরি? বা দ্বিতীয় বিবাহের জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া কি জরুরি?*

আব্দুল মুমিন, শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তর ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষ ব্যক্তি প্রয়োজনে একই সাথে চারজন স্ত্রী বিয়ে করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

পছন্দমত দুই, তিন, চারজন স্ত্রী বিয়ে কর। আর যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশঙ্কা হয় তাহলে

একটাই যথেষ্ট মনে কর।[৮] এ আয়াতে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। ১. প্রয়োজনে একই সাথে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী বিয়ে করতে পারে। আর এটা নিজের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী হবে, কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। ২. তবে শর্ত হলো, সকল স্ত্রীকে ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে। কাউকে বেশি সুবিধা, কাউকে কম এমনটা করা যাবে না। বরং এমন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে একের অধিক বিয়ে করা উচিত নয়। ৩. বেইনসাফীর আশঙ্কা অনেক সময় স্বেচ্ছায় হয়, আবার অনেক সময় সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। অতএব, যে কারণেই হোক আশঙ্কা হলে একটাই যথেষ্ট মনে করা উচিত। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলামু।

☞ **প্রশ্ন (৯) :** ***অনেক ইয়াতিমখানায় ইয়াতিম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ কোনো কোনো সময় খাশি বা গরু হাদিয়া দিয়ে থাকে। সেই গরু বা খাশি ইয়াতিমখানায় যবেহ হলেও গোশতের অর্ধেক ভাগ নিয়ে নেয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ। এ হাদিয়া পরিচালনা পরিষদের জন্য গ্রহণ করা কতটুকু বৈধ?***

উত্তর ইয়াতীমখানা বা ইয়াতীম ছাত্রদের হাদিয়া পরিচালকের জন্য সাধারণত বৈধ নয়। তবে পরিচালক যে সময় ও শ্রম দিয়ে থাকেন তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন। তবে শর্ত হলো, যদি পরিচালক দরিদ্র হন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

যে পরিচালক বা পৃষ্ঠপোষক ধনী তিনি ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ হতে পবিত্র থাকবেন, আর যিনি দরিদ্র তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারেন।[৯] দরিদ্র হলেও ইচ্ছামত অর্ধেক খেয়ে ফেলবেন এমনটা অবশ্যই অন্যায় হবে। দ্বিতীয় বিষয়, ইয়াতীমরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের হাদিয়া-সাদকা হতে পরিচালককে আপ্যায়ন করাতে চায়, তা তাদের জন্য বৈধ। তবে কোনো প্রভাব খাটিয়ে আপ্যায়ন গ্রহণ করা বা অংশ নেয়া মহাঅন্যায় হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে, তারা অচিরেই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।[১০]

☞ **প্রশ্ন (১০) :** ***অযু করে এশার স্বলাত পড়ে এসেছি, তারপর অযু নষ্ট হয়েছে। এখন অযু করতে সক্ষম তারপরও তায়াম্মুম করলে কি রাতে অযু করে শুয়ে থাকার ফজিলত পাব?***

আ: ওয়াহেদ, খোকসা, কুষ্টিয়া

উত্তর : না; সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে অযুর ফযীলত পাওয়া যাবে না। বরং এটা অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন হবে। ওয়াল্লাহু আলাম।

☞ ***প্রশ্ন (১১) : অনেককে বলতে শোনা যায়, আল্লাহর কুদরতি পায়ে পড়ে সিজদা করে ক্ষমা চাচ্ছি। এ কুদরতি পা কী এবং এভাবে বলা যাবে কি?***

ইদ্রীস আলী, লোহাগড়া, নড়াইল

উত্তর : কুদরতি পা অর্থ হলো আল্লাহর "পা" সিফাতকে কুদরত দিয়ে ব্যাখ্যা করা। এটা মূলত অপব্যাখ্যা, যা নিষিদ্ধ। নাবী ﷺ বলেন:

" يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ قَطْ قَطْ "

জাহান্নামীদের জাহান্নামে ফেলা হবে, এরপরও জাহান্নাম বলবে আরো আছে কি? ফলে আল্লাহ তাঁর 'পা' জাহান্নামের মুখে রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে কাত, কাত।[১১] এ জাতীয় বহু সহীহ হাদীস রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাত হচ্ছে 'পা'। এর ধরন-গঠন একমাত্র আল্লাহ জানেন।

[৮] *সূরা নিসা আয়াত: ৩*
[৯] *সূরা নিসা আয়াত: ৩*
[১০] *সূরা নিসা আয়াত: ১০*
[১১] *সহীহ বুখারী হা: ৪৮৪৮, সহীহ মুসলিম হা: ২৮৪৬*

কোন অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি ছাড়াই ঈমান আনা আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ।

ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ সকল ইমাম এরূপই বলেছেন। সুতরাং কুদরতি পা বা কুদরতি হাত ইত্যাদি অপব্যখ্যা যা সঠিক আকীদাহ পরিপন্থী। এছাড়াও পায়ে পড়ে সিজদা করে ক্ষমা চাচ্ছি এমনটাও বলা উচিত নয়। কারণ আল্লাহর পায়ে পড়ে কারো পক্ষে সিজদা দেয়া সম্ভব নয়। বরং আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর উসিলায় ক্ষমা চাওয়া উচিত। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলাম।

☞ প্রশ্ন (১২) : ***আমার কিছু টাকা হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে একজন হুজুরের নিকট যাই। অতঃপর তিনি আমাকে তিনটি সুঁই (সুঁচ) পড়ে দেন। তিনটির মধ্যে ১টি চুলার মাঝে নিক্ষেপ করতে এবং অপর দুটি সুঁচ গাছের সাথে গেঁথে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমি অজ্ঞতাবশত এ কাজটি করে ফেলেছি। এটি কি শিরক হয়েছে? এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?***

তাসলীম আহমাদ, দাকোপ, খুলনা

উত্তর : প্রথম কথা হলো-যারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ঝাড়ফুঁক করে না তাদের কাছে যাওয়াটাই অন্যায়। দ্বিতীয় বিষয়, উক্ত কাজ জিন-শয়তানের আশ্রয় নিয়ে করলে অবশ্যই শির্ক হবে। তবে সর্বাবস্থায় আপনার কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে সত্যিকার তাওবা করা এবং এ জাতীয় কর্ম হতে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে বিরত রাখা। ইনশা আল্লাহ, তিনি ক্ষমা করবেন।

☞ প্রশ্ন (১৩) : কেউ যদি রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে যায়। তারপর ফজরের পর নফল রোযার নিয়ত করে, তার রোযা হবে কিনা জানতে চাই।

জনাব, খাইরুল ইসলাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তর : ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রে ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত করে নিশ্চিত হতে হবে, নচেত রোযা সঠিক হবে না।[১২]

নফল রোযার ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের পরে কোন পানাহার না করলে সকাল বেলা নিয়্যাত করলে রোযা হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন একদিন সকাল বেলা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন, কোন নাস্তা রয়েছে? থাকলে দাও। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম থাকলাম।[১৩]

☞ প্রশ্ন (১৪) : কোন মুসলিম যদি মদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি হারাম মাল অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে তাহলে কি তার উপার্জন বৈধ হবে? এ ব্যাপারে শরিয়াতের হুকুম কী?

জহুরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : মহান আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম করলে তার মূল্যও হরাম করেন। কাজেই হারাম বস্তু অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে উপার্জন করলেও তা হারাম হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

"ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। অথচ তারা তা বিক্রি করল এবং এর মূল্য খেল। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন বস্তুকে হরাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" হাদীসটি সহীহ।[১৪]

☞ প্রশ্ন (১৫) : কোন মুসলিম যদি মদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি হারাম মাল অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে তাহলে কি তার উপার্জন বৈধ হবে? এ ব্যাপারে শরিয়াতের হুকুম কী?

জাফর ইবকবাল, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর

উত্তর : *তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত ইশার নামাযের পরই শুরু হয়, আর শেষ হয় ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত। তবে রাতের দুই অংশ অতীত হতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়টি তাহাজ্জুদের জন্য উত্তম সময়।[১৫] রাত্রে জাগ্রত হওয়া নিশ্চিত হলে বিতর পড়বে না। বরং তাহাজ্জুদের পর পড়বে। আর অনিশ্চিত হলে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যাবে অতঃপর জাগ্রত হলে তাহাজ্জুদ পড়বে, পুনরায় বিতর পড়তে হবে না।[১৬]*

---

[১২] *আবূ দাউদ হা: ২৪৪৫ সহীহ*

[১৩] *সহীহ মুসলিম হা: ১১৫৪*

[১৪] *গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালা-লি ওয়াল হারাম' আলবানী হা/৩১৮।*

[১৫] *সহীহ বুখারী হা: ১০৯০, সহীহ ফিকাহুস সুন্নাহ-১/৪০০ পৃ*

[১৬] *সহীহ মুসলিম হা: ৭৫৫, সহীহ ফিকহু সুন্নাহ-১/৩৮৬ পৃ:*